স্বপ্ন-সুধা

প্রথম ভাগ

মশিদপুর আই, জে, মাদ্রাসার ভূতপূর্ব্ব হেড্‌মাষ্টার
সরদার আব্দুল হামিদ মিঞা এম, এ (ইকন্‌- প্লাকড্‌)

[মূল্য এক টাকা

মসাম্মাৎ এম, এম, বেগম
সাং দেওপুরা ; পোঃ মহনপুর
জিলা—মালদহ

প্রথম সংস্করণ
১৩৪৭

প্রিণ্টার-
শ্রীতারাপদ ব্যানার্জ্জী
দি মডেল লিথো এণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৬৬।১এ, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা

উপহার

সূচীপত্র

ভূমিকা

আমার মালদহের হামিদ ছাপানো লেখাগুলা লইয়া হাজির। অতএব একটা কিছু লিখিতেই হইবে।

পড়িতে লাগিলাম। বেশ ভাল লাগিল। ঝর্-ঝরে বাংলা চিন্তায় গোঁজামিল নাই। বরং সব কিছুই খোলা প্রাণের খেয়াল,—বুজ্‌রুকিহীন ও সুস্পষ্টো।

যে কোন পাঠকেরই মেজাজে তাজা তাজা চিন্তাগুলা কিছু না কিছু দাগ বসাইতে পারিবে। হামিদ ছোকরা,—কিন্তু এই বয়সেই দুনিয়ার গভীর গভীর কথাগুলা লইয়া মগজ খেলাইতে অভ্যস্ত। মগজটা খেলেও বেশ দরদের সহিত। দরদওয়ালা লেখকের আবহাওয়ায় আসিলে ছেলে-ছোকরাদের মরমে কিছু-না-কিছু ঘা লাগিবে। প্রবীণেরাও বেশ কিছু পুলকিত হইতে পারিবেন।

হামিদ যখন তখন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নগুলাকে ভাষায় রূপ দিয়া হামিদ লোকজনের নিকট নিজের আত্মাটাকে খুলিয়া ধরিয়াছেন। এই আত্মার ভিতরটায় প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়া পাঠকেরা আনন্দ পাইবেন বিশ্বাস করি।

কলিকাতা—
২৪শে এপ্রিল, ১৯৪০

(ডাঃ) বিনয় সরকার

উৎসর্গ.

যাহার ঋণের কণামাত্র পরিশোধ করিতে আমি অক্ষম, আম্মাজানের ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ যিনি আমাকে শৈশবে পুত্রাধিক স্নেহে নিজ গৃহে লালন পালন করিয়াছেন এবং আজীবন আমাদের শুভ কামনা করিয়া গিয়াছেন আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্রী সেই মরহুমা নানী সাহেবাণীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম। ইতি।

ঘুঘুডাঙ্গা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ } আব্দুল হামিদ

নিবেদন

পাঠ্যাবস্থায় পুস্তক প্রকাশ করা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী না হইলে বুঝা যায় না। প্রথমতঃ অভিজ্ঞতার অভাবে পুস্তক মুদ্রন ব্যাপারে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়: দ্বিতীয়তঃ সে পুস্তক বিক্রয়ের এজেন্ট পাওয়া যায় না। উপরন্ত নূতনত্বের গন্ধ থাকে বলিয়া সাধারণতঃ কেহ নূতন লেখকের বই পড়িতে চান না। এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যাঁহাদের উৎসাহে স্বপ্ন-সুধা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমাদের সামাজিক জীবনের প্রাণ হইতেছে সৎগ্রন্থ। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য প্রভুত্ব কর্ত্তৃক আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের যে ক্ষতি হইয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভ্রান্ত অনুকরণের জন্য আমাদের সামাজিক জীবনের তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে। তাহার ফলে বাজারে পুস্তকাকারে যাহা চলিতেছে তাহার অধিকাংশই লক্ষ্যহীন উচ্ছৃঙ্খল গড্ডালিকা প্রবাহের তরঙ্গে ন্যায় অথবা হলাহল পরিপূর্ণ এবং সামাজিক স্বাস্থ্য ধ্বংশকারী। সমাজের এই রোগ দূর করার অভিপ্রায়ে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। স্বপ্নসুধার আলোচ্য কঠিন বিষয়গুলি যথাসাধ্য সহজ করিবার চেষ্টা

করিয়াছি। ইহার পাঠক পাঠিকাগণের চিন্তাস্রোত এই দিকে এতটুকু নিয়ন্ত্রিত হইলে ও শ্রম সার্থক মনে করিব।

এই পুস্তকে যে দুই একটা ভুল ত্রুটী দৃষ্ট হইবে, আশা করি আমার সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ সেগুলি অনিচ্ছাকৃত জানিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

স্বপ্ন-সুধা

প্রথম ভাগ

(দাতা, দয়ালু বিশ্বপ্রভুর নামে আরম্ভ করিতেছি)

গতি

একদিন নৌকায় চড়িয়া কোথাও বেড়াইতে যাইতেছি— মহানন্দা নদীর বুকের উপর দিয়ে। অন্ধকার রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকার রব, দুই একটা সজাগ কুকুরের চীৎকার ও দাঁড়ের একটানা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ শুনা যাইতেছে; মাঝে মাঝে একটু ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে এবং নৌকার আঘাতে জলগুলি কল্ কল্ করিয়া সাড়া দিতেছে। এমনি করিয়া নৌকা চলিয়াছে, আর আমি শুইয়া নদী সম্বন্ধে আকাশ পাতাল ভাবিতেছি।—

এমন সময় কাহার ডাকে যেন আমার সকল ভাবনা কাটিয়া গেল। দেখিলাম একজন বুড়া মানুষ আমাকে ডাকিতেছেন। বয়স হইলেও সুন্দর চেহারা, পরণে ধব্ ধবে সাদা ধুতি, পাড় নক্সা করা, রং সবুজ। লম্বা পাকা দাড়ী ও সাদা বাবরীতে বেশ খাপ খাইয়াছে। দেখিলেই একজন

প্রাচীন কবি বলিয়া ভ্রম হয়। উদার চাহনি ও গম্ভীর ভাব দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়।

তিনি বলিলেন, "হামিদ, এদিকে নেমে এস।" আমি তাঁহার এইরূপ স্বাভাবিক স্বর ও পরিচিতের মত কথাবার্ত্তা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি আমার নামটি জানিলেন কিরূপে ?

আমাকে এইরূপ থতমত খাইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ—আশ্চর্য্য হবারই কথা। তুমি আমাকে চেন না, অথচ আমি তোমার নাম পর্য্যন্ত জানি। এটা তোমার কাছে অদ্ভুত বটে, কিন্তু এটা আমার কাছে স্বাভাবিক হ'ল কি করে তার কারণ বলছি, শোন,—আমার নাম মহানন্দা। আমি প্রায় দু'হাজার বছরেরও বেশী কাল হ'ল এখানে বাস করছি। মাল-দহ ত এই সেদিন হ'ল। তার কত আগে কত সব রাজা রাজড়ারা আমার বাড়ীর কাছ দিয়ে বজরা ভাসিয়ে যেত, কত লড়াই হ'ল, কত কাণ্ড হয়ে গেল আমার সামনে,—যাক, সে সব কথা বলে আর কাজ নাই। তা—, কি যেন বলছিলাম : হাঁ এই তোমাকে কেমন করে চিনলাম তাই বলি। গত বৎসর বর্ষার সময় তুমি ধোপার ঘাটে একদিন স্নান করতে এসেছিলে মনে পড়ে কি ? ঐ যেদিন সে ঘাটে একটা মরা গরু ভেসে যাচ্ছিল আর তার উপর কতকগুলো শকুনি পড়ছিল, তাই দেখে তোমার এক সঙ্গী বলে উঠলো যে, নদীতে স্নান

করা ঠিক নয়, নদীর জল খুব খারাপ, নদী অপদার্থ ইত্যাদি; আর তুমি তাকে বাধা দিয়ে আমার গুণ সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। সে দিনের কথা মনে পড়ে কি? সে দিন আমি কাছেই লুকিয়ে ছিলাম, আর তোমার কথা শুনে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল। তোমাকে সেদিন থেকে ভালবাসলাম। তখনি তোমার নামটি জানতে ইচ্ছা হ'ল, সুযোগও শীঘ্রই পেলাম; তোমার অপর সঙ্গী তখন বলেছিল, 'ও—হামিদ না হ'লে এসব ব্যখ্যা করবে কে?' তখনি তোমার নামটা মুখস্থ করে ফেললাম। সেদিন থেকেই তোমাকে নিরালায় পেতে ও মনের কথা জানাতে বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু তা' হয়ে উঠেনি—আজ দয়াময় সে সুযোগ দিয়েছেন, তাই দুটি মনের কথা বা উপদেশ যাই বল তোমাকে বলতে এসেছি। আমি বৃদ্ধ হ'লেও তোমার বন্ধু বলে জানবে, এস, ভয় নাই। আমি শপথ করে বলছি, তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।"

এতক্ষণে আমি তীরের দিকে লক্ষ্য করিলাম, দেখিলাম নৌকা তীরে বাঁধা, আর তিনি একটু দূরে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন! তাঁহার মুখে চোখে এমন একটা সত্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি আর না যাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে চাঁদ উঠিয়াছিল, আমরা চাঁদের আলোয় একটা পরিষ্কার যায়গা দেখিয়া ঘাসের উপর বসিলাম।

তিনি বলিলেন—আচ্ছা বল দেখি নদী কাকে বলে?

আমি—কেন, যে জলস্রোত পর্ব্বত কিম্বা হ্রদ হইতে বাহির হইয়া বহু স্থান দিয়া বহিয়া অবশেষে সাগরে কিম্বা হ্রদে পড়ে তাহাকেই নদী বলে।

তিনি—না এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হ'তে পারলাম না; আর কিছু জান কিনা বল।

আমি—ছোট বেলায় যা ভূগোলে পড়েছি তাই বললাম, আর কিছু-ত জানি না।

তিনি—জান না, তবে শোন,—স্রষ্টার যে আশীষ ধারা বৃহৎ হ'তে বাহির হয়ে পুণ্যভূমিকে উর্ব্বর ও পাপীর গৃহকে ধ্বংশ ক'রে শেষে বৃহত্তমের সহিত মিলিত হয়, তাকে নদী বলে।

আমি—আচ্ছা, আপনি যে আমাকে হঠাৎ নদী সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন তার উদ্দেশ্য কি?

তিনি—হাঁ, উদ্দেশ্য আছে, নদীর ভিতর দিয়ে তোমাকে কিছু উপদেশ দিব বলেই প্রথমে নদীর ব্যাখ্যা করতে বলেছিলাম। যা'ই হোক, এখন আমি নদী সম্বন্ধে যে সব কথা বলব সেগুলি খুব মন দিয়ে শুনবে, এবং তাহলেই বুঝতে পারবে যে নদী ও মানুষের কিরূপ সম্বন্ধ এবং নদী মানুষকে কি উপদেশ দেয়।

"প্রথমতঃ দেখতে পাও বিশাল সমুদ্রের জলকণাগুলি রৌদ্রের উত্তাপে বাষ্পের আকারে বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়, তারপর সেই বাষ্পগুলি একসঙ্গে মিলে মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘ যখন কোন পর্ব্বতের ঠাণ্ডা গা ঘেঁসে ভেসে যায়,

তখনি সে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য জমে তুষার হ'য়ে পর্ব্বতের গায় জমা হয়। সেই তুষারগুলো গ'লে আস্তে আস্তে নামতে থাকে। পরে সেগুলি নদীর সৃষ্টি করে। তারপর সেটা বহু দেশের মধ্য দিয়ে কাউকে হাসায়ে কাউকে বা কাঁদায়ে ছুটতে থাকে সেই সাগরের উদ্দেশে। পরে তার আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়ে সাগরের কাছে হাজির হয়।"

আমি—বেশ : কিন্তু এতে মানুষের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ?

তিনি—বলবার জন্যইত আজ বসেছি। ব্যস্ত হয়োনা। আমি ধীরে ধীরে বলে যাই, আর তুমি মন দিয়ে শুনে যাও।

"তেমনি মানুষের বেলায় দেখ, সে প্রথমে দয়াময় বিশ্ব স্রষ্টার নিকট থাকে। তারপর সে ক্ষুদ্র আকারে পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে কিছুদিন (প্রায় দশ মাস) বাস করে। তারপর সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে নিয়ে ছুটতে থাকে সেই স্রষ্টার উদ্দেশে। এখন দেখ, মানুষ আর নদী একরূপ কিনা।"

আমি—আপনি বললেন যে, মানুষকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিন্তু নদীরত কোন দুঃখ নাই, সে ক্রমাগত একই ভাবে অতি সহজে বয়ে যাচ্ছে।

তিনি—হাঃ, হাঃ ; পাগল আর কি ! নদীর কষ্ট যে কিরূপ তা আমি জানি। সেই প্রথম যখন পর্ব্বত হ'তে বেরিয়েছিলাম সে দিনের কথা মনে হলে প্রাণ কেঁপে উঠে।

উঃ, সে কা এক একটা গভীর গর্ত্ত ভরতে হয়েছিল : কী সব এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় কেটে রাস্তা করতে হয়েছিল। কত সব উঁচু, নীচু, খাল, বিল, বন, উপবনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল!

আমি—নদীর আবার জমা খরচ কি রকম?

তিনি—তা—আর বুঝলেনা? এই কতটা জল তার পরে নিয়ে গেল, কতটা জল শাখা প্রশাখা হয়ে বেরিয়ে পালিয়ে গেল, এই সব হচ্ছে নদীর খরচ। আর কতটা গাছ পালা, জীব জন্তু, ঘর বাড়ী সে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এ সমস্ত হচ্ছে তার জমা। মোট কথা তুমি একটু চিন্তা করলেই নদী যে সকল দিক দিয়েই মানুষের মত, এটা আপনি বুঝতে পারবে।

আমি—আচ্ছা, নদী মানুষকে কি শিক্ষা দেয়?

তিনি—হাঁ, এটা একটা প্রশ্ন বটে। নদী মানুষকে অনেক কিছুই শিক্ষা দেয়; তবে আমি এখানে তোমার সবচেয়ে দরকারী বিষয়টারই উল্লেখ করব।—দেখ, মানুষের ছয়টা রিপু আছে। যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। এই ছয় রিপু ফাঁক পেলেই মানুষকে কুপথে নিয়ে যায়। তখন মানুষ জগৎ স্রষ্টাকে ভুলে যায়। তার গতি কোন দিকে, তার জীবনের উদ্দেশ্য কি সব ভুলে যায়। তখন নদী তার কুলু কুলু স্বরে বলে—'মানুষ সাবধান! আমি যেমন বৃহৎ হতে এসে সেই বৃহতের দিকেই যাচ্ছি, তেমনি তোমরা ও এক অসীমের নিকট হ'তে এসে তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছ। সেখানে একদিন

তোমাদের ভাল মন্দ সকল কাজের খতিয়ান নিয়ে দাঁড়াইতেই হবে। লক্ষ্য ঠিক কর; কারণ তোমাদের একমাত্র গতি সেই বিশ্বপতির দিকে। তোমরা হাজার চেষ্টা করলেও এ গতি ফিরাতে পারবে না, কারণ এটা হচ্ছে খোদাদত্ত গতি।' বুঝতে পেরেছ?

আমি—হাঁ, আপনি যে আজ আমাকে এই সমস্ত অমূল্য উপদেশ দিলেন, এজন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ।—

ইতি মধ্যে আমার কানে মাঝিদের গলার স্বর পৌঁছিল। তিনি বলিলেন—ঐ দেখ, তোমার মাঝিরা তোমাকে ডাকছে। ওরা বোধ হয় এখনি নৌকা খুলবে। তুমি যে ধৈর্য্য ধরে আমার কথা গুলি শুনলে এ জন্য আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। তা হলে আসি এখন।

পর মুহূর্ত্তেই তিনি যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন আমি বুঝিতে পারিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে শুনিতে পাইলাম মাঝিরা "বাবু, বাবু" করিয়া ডাকিতেছে।

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—আরে বোকার মত চেঁচাস্ না: নৌকা খোল যাচ্ছি।

তখনি একটা হাসির কোলাহল উঠিল, আর সেই সঙ্গে আমার ঘুম ও ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম নৌকা নির্দ্দিষ্ট ঘাটে লাগিয়াছে। বুঝিলাম এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিয়াছি।

—কিন্তু, কেবলি কি স্বপ্ন?

মালদহ বোর্ডিং }
ইং ২১।৭।২৯ }

—:—

ফকির

রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজ সংলগ্ন ফুলার হোষ্টেল মুসলমান ছাত্রদিগের থাকিবার স্থান, পদ্মার ধারে দ্বিতল পাকা ঘর। দূর হইতে দেখিলে একটা রাজবাড়ী বলিয়া মনে হয় এমনি তার গঠন প্রণালী। এখানে আমরা প্রায় ষাট, পঁয়ষট্টি জন কলেজের ছাত্র বাস করি। এই বাড়ীটা একেবারে নিজস্ব হইলে কতটা গর্ব্ব অনুভব করিতাম জানি না; তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, এহেন বাড়ীটার একটা 'সিট্' ও যে মাসিক চারি টাকা ভাড়া দিয়া দখল করিয়া আছি এজন্য নেহায়েৎ কম গর্ব্বিত নহি। তাহার প্রমাণ এই যে, কোন লোককে এতবড় বাড়ীটার দিকে আসিতে দেখিলে মেজাজ আপনা হইতেই কেমন যেন গম্ভীর হইয়া উঠে আর বুকটা অসম্ভব রকম ফুলিতে থাকে। আর সেই আগন্তুকটি ভদ্রতার গণ্ডী ছাড়াইয়া (?) ভুলিয়া যদি কোন প্রশ্ন করিয়া বসেন, তবে সম্ভবমত একটা 'ছোট' উত্তর দিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আর একটু গম্ভীর হইয়া খুব বিজ্ঞের মত দুনিয়াটাকে লক্ষ্য করিতে থাকি; এবং সেই লোকটাকে উত্তর দেওয়ায় পদমর্য্যাদা ঠিক থাকিল কি না সেই বিষয় চিন্তা করিতে থাকি।—

সাড়ে চারিটায় কলেজের ছুটি হইয়াছে। তাই সকল

শ্রেণীর বন্দোবস্ত করা ফেরীওয়ালা সময় মত নানা রূপ খাবার জিনিষ লইয়া আসিয়াছে, এবং বাদশাহী আমলের অমূল্য 'হুজুর,' 'হুজুর' শব্দে সকলের মনোস্তুষ্টি করিতেছে। আর সকল ছাত্রই জোর গলায় আপন আপন হুকুম চালাইতেছেন। [তবে এই সমস্ত ফেরীওয়ালাদের ও আমাদের মেজাজের একটু পরিবর্ত্তন তখনই দেখা যায়, যখন ফেরীওয়ালার নিকট অনেক টাকা বাঁকী হইয়া যাওয়ার পরে ও অদূরদর্শী (?) অভিভাবকগণ টাকা পাঠাইতে অনর্থক বিলম্ব করেন।]

এমন সময় একজন ঝুলিওয়ালা লোক আসিল' তাহার হাতে একটা সাধারণ বাঁশের লাঠি, পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, মাথায় ছোট কর্কশ চুল (পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত), শরীরটা ময়লা ও বড় দুর্ব্বল। ঝুলিটার অবস্থা তত সুবিধাজনক না হইলেও তাহাকে কতকগুলি কাপড়ের নমুনা বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না। দেখিলেই বুঝা যায় যে, সে কিছু দিতে ত আসেই নাই বরং কিছু লইতে আসিয়াছে। সে একজন ফকির।

সেই অদ্ভুত লোকটার দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র, জানি না কেন, অধিকাংশ ছেলেরই মুখাকৃতি কিরূপ যেন বিকৃত হইয়া আসিল। তাহার পর যখন সে "দয়া হয় বাবু -একটা পয়সা দেন হুজুর, পরশু থেকে না খেয়ে আছি প্রভৃতি বলিয়া সকলের করুণা প্রার্থি হইল, তখন দুই একজন, যাঁহারা পল্লীগ্রাম হইতে নূতন সহরে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছেন, তাঁহারাই দুই একটা পয়সা

দিলেন, তাহা ছাড়া অন্যান্য সকলে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেহ নাস্তায় মনোনিবেশ করিলেন, কেহ বা ফেরা-ওয়ালার সঙ্গে বাজে কথা বলিতে লাগিলেন (ভাবটা এইরূপ, যেন এখন তাঁহার ভিক্ষা দিবার সময় নাই)। কেহ আবার (তাহার কাছে টাকার পয়সা হইবে না ইহা নিশ্চিত জানিয়া) বলিলেন, "কিহে, তোমার কাছে টাকার পয়সা হবে ?" অর্থাৎ টাকার পয়সা তাহার মত ভিক্ষুকে দিতে পারিলে তবেই একটা পয়সা পাওয়া বোধ হয় সম্ভব ছিল।

একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, তুই কি জাত ? তোর নাম কি ?" সে বলিল, "আজ্ঞে, আমার নাম জয়রাম, আমরা জাতিতে পাহিড়া (পাহাড়ি)।" উত্তর শুনিয়া প্রশ্নকারী অপূর্ব্ব মুখভঙ্গি সহকারে বলিলেন, "ব্যাটা হিন্দু, ত এ হোষ্টেলে এসেছিস কেন ? ও দিকে—ও—ই—নিউ হোষ্টেলে যা ; ওখানে হিন্দু ছেলে অনেক আছে, ওখানে গেলে অনেক পাবি। যা—যা—এখান থেকে ! পালা, পালা !!" "তাই যাচ্ছি বাবু" বলিয়া সে একটা সালাম দিয়া বাহিরে যাইবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। আমি তাহার সেইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ডাকিয়া কিছু দিলাম। সে "ভগবান আপনাকে রাজা করুক বাবু" বলিয়া তাহার চিরমলিন মুখখানায় করুণ হাসি হাসিয়া একটা সালাম দিয়া চলিয়া গেল। জানিনা পূর্ব্বের সালামের সঙ্গে পরেরটার কত প্রভেদ !

তারপর যখন ঘরে আসিলাম তখন শুনিতে পাইলাম কেহ বলিতেছেন, "আগে কেবল মুসলমান ফকিরই দেখা যেত, এখন কিন্তু তাদের দেখা দেখি হিন্দু ফকিরের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।" কেহ বলিতেছেন, "আমরা এই বাঙ্গালী জাতি ভিক্ষুককে প্রশ্রয় দেওয়াতেই তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আর কোথাও এত ফকির নাই।" কেহ বা বলিতেছেন, "আমার মনে হয় এরকম একটা আইন করলে ভাল হয় যে, যে কেহ কোন ফকিরকে দেখতে পাবে, সেই সে ফকিরকে জোর করে খাটিয়ে নিবে, তবে তার উপযুক্ত মজুরী দিতে হবে, না দিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে। আর এক কথা, কোন রোগা ফকিরকে খাটাতে পারবে না এবং যে ফকিরকে যে কাজের উপযোগী দেখা যাবে তাকে সে কাজেই লাগাতে হবে (কে কোন কাজের উপযোগী তাহা পরীক্ষা করিয়া পুলিশ প্রত্যেক ফকিরের গায়ে একটা ছাপ মারিয়া দিবেন), ফকিরের প্রতি কেহ অন্যায় অত্যাচার করিতে পারিবে না এবং বিনা পাশে কেহ ভিক্ষা করিতে পারিবে না। দেখ, এরকম করলে দেশে ফকিরের সংখ্যা কমে আসবে, দেশের লোক কাজ করতে শিখবে, দেশ আবার উন্নত হবে।"

একজন বলিলেন, "যাহোক তোমার বুদ্ধি ভাই। এমন দু চারটা লোক যদি কংগ্রেসের নেতা হ'ত তবে ভারতবর্ষ এতদিনে অনেক উন্নতি লাভ করতো, তা নয় কতকগুলো

'গোবর-গণেশ' কংগ্রেসের নেতা হয়ে কেবল 'বন্দে মাতরম্' আর 'গ্রেপ্তার', আজ হরতাল কাল বিলেতী বর্জ্জন, পরশু কলেজ বয়কট, এসমস্ত করে বেড়াচ্ছে। তাতে দেশের লাভ ত দূরের কথা ক্ষতিই হচ্ছে বেশী। কি বলহে? আচ্ছা দাদা, তোমার নূতন আইনে ত কানা খোঁড়া ফকিরের কোন উল্লেখ নাই। তারা কি করবে?"

উত্তর হইল, "হাঁ, আমি কি তাদের কথা না ভেবেই আইনের কথা বলেছি। তাদের জন্য এক মজার উপায় ঠিক করেছি। দেশের যত সব কানা, খোঁড়া ফকির থাকবে, তাদের অল্প বেতনে সরকার তার স্কুল, কলেজ, হোষ্টেল আর অন্যান্য সমস্ত অফিসে নিযুক্ত করবে। তারা আপন সাধ্য মত সে সব জায়গায় কাজ করবে। কেহ পাখা টানবে, কেহ ঘর ঝাড় দিবে, কেহ বাসন মাজবে, কেহ বাবুদের জুতা সাফ করবে, পায়ের আঙ্গুল টেনে দিবে—ইত্যাদি যে যে রকম পারবে সে তাই করবে।"

সকলে বলিয়া উঠিলেন, "সাবাস ভাই, ধন্য তোমার মাথা! বেঁচে থাক দাদা, দেশের কাজে লাগবে।" তাহার পর যেরূপ হাসি আর গোলমাল, তাহা বর্ণনার মত ভাষা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হউক একটু পরে যখন হাসির জোয়ারে ভাটা আসিল তখন মজলিস্ ভঙ্গ করিয়া সকলে নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন। তাহার পর কলেজের মাঠে ধুম ধুম করিয়া ফুটবলের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া

অনেকে খেলায় যোগদান করিলেন আর আমরা দুই তিনজন ছাত্র পদ্মার বাঁধ ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।—

সন্ধ্যার একটু পরে যখন হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম তখন সেখানে বেশ একটা হৈ, চৈ, পড়িয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম—একটা ফকির (সম্ভবতঃ জয়রাম) কাচারীর রাস্তা ধরিয়া যখন যাইতেছিল সেই সময় দৈবক্রমে স্থানীয় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মোটর গাড়ীর তলায় পড়ে। যাহা হউক সৌভাগ্যবশতঃ সে বাঁচিয়া গিয়াছে (?) তবে তার একটা পা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। পুলিশ সাহেব দয়া করিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শুনিয়া মনে বড় দুঃখ হইল। মনে করিলাম এইরূপ বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যাহা হউক একবার তাহাকে দেখিতে যাওয়া এবং বাস্তবিকই সে জয়রাম কিনা সেটা জানা উচিত বলিয়া মনে করিলাম। কাজেই পরদিন হাসপাতালে যাইব স্থির করিলাম।

হাসপাতালের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে চাহি না ; তবে এইটুকু বলা যায় যে, ইহা একটা অসহায় রোগীদিগের নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়। ইহা কোন অবস্থাপন্ন লোকের উপযুক্ত থাকিবার স্থান নহে, এবং এখানে আসিলে সুস্থ ব্যক্তির শারীরিক রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও মন অনেকটা অসুস্থ হইয়া পড়ে।

অনুসন্ধান করিয়া জয়রামের 'সিটের' নিকটে গেলাম। হাঁ, এ পূর্ব্বের সেই জয়রামই বটে, তবে চিনিবার উপায় নাই। একদিনেই চেহারার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভাঙ্গা বাম পা খানায় ব্যাণ্ডেজ করা হইয়াছে। তাহা ফুলিয়া ডান পায়ের দ্বিগুণ হইয়াছে। সে জ্বরে একরূপ অজ্ঞান। সংসারের কোন খবরই সে রাখে না। তবে যন্ত্রনা অসহ্য বোধ হওয়ায় মাঝে মাঝে অস্ফুট করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছে। আহা, অসহায় বেচারী! বোধ হয় তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। মনে মনে বলিলাম, "দয়াময়! হয় তাকে এ অবস্থায় তোমার কোলে টেনে নাও, আর না হয় তাকে শীঘ্রই পূর্ণরূপে সুস্থ করে তোল…।"

দেখিয়া শুনিয়া হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পর ঠিক সময় মত স্নান, আহার, কলেজ যাওয়া, খেলা, হাসি-তামাসা সবই চলিতে লাগিল। বৈকালে একবার মনে হইল—যাই, জয়রামকে দেখে আসি আর নার্সকে ছু' চার আনা দিয়ে বলে আসি যেন সে জয়রামের দিকে একটু সুনজর রাখে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে লইল—দূর, আমি কি পাগল হয়েছি? কোথাকার এক হিন্দু ফকির, নিজের দোষে মোটর চাপা পড়বে, তাতে আমার কি? সে মরলে বা বাঁচলে আমার কি আসে যায়? দুনিয়াতে এমন কত ফকির দিন রাত ভুগছে, তাদের খবর কয় জনে রাখে? আর রাখতে চাইলেই কি সেটা সম্ভব হয়?…

হায়রে মানুষ! তুমি ত এক অদ্ভুত জীব, তাহার উপর তোমার ওই মনটা আরও অদ্ভুত! সেটাকে জানিতে চেষ্টা করা বোধ হয় জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ। সে এক সময় দয়া, দরদ ও সহানুভূতি দেখাইতে দেবতাকে ও পরাস্ত করিতে চাহে আবার পরক্ষণেই সে শত্রু অপেক্ষা নিষ্ঠুর হইতে ও বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিতে পারে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, তবে এই টুকু নিশ্চয় বলিতে পারি যে, আমার মনকে আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, এবং কখন পারিব তাহাও ঠিক জানি না। মন কেবল ঠিক থাকে তাঁহাদিগের কাছে যাঁহারা মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। তাঁহাদিগের আসন বহু উচ্চে। সেইরূপ মানুষই এই জগতে থাকিয়া স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে পারেন। আমাদের মত চঞ্চলমতি লোক নহে।...

যাহা হউক মনকে ঠিক করিয়া (?) জয়রামের চিন্তা দূর করিলাম। তাহার পর শরীরটাকে একটু হাল্কা করিবার জন্য ফুটবল খেলিতে নামিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ 'গোল কিপার' পদে নিযুক্ত হওয়ায় জয়রামের চিন্তা মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল, এবং হঠাৎ একটা 'গোল' খাইয়া আমার মন আরও খারাপ হইয়া গেল। কোনরূপে খেলা শেষ করিয়া পদ্মার ধারে বেড়াইতে গেলাম। সেখান হইতে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তাহার পর পাঠ্য পুস্তকগুলির মধুর চাহনিতে সকল বিষয় ভুলিয়া নূতন চিন্তায় মনোনিবেশ করিলাম।

পরদিন সকালে একবার হাসপাতালে যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সেদিন পড়ার চাপ একটু বেশী ছিল বলিয়া আর সেখানে যাওয়া হইল না। মনে করিলাম বৈকালের দিকে গেলেই চলিবে।

বৈকালে কলেজ হইতে আসিয়া দেখি ফেরীওয়ালারা কেহই তখন আসে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় এদিকে পেট চন্ চন্ করিতেছে। কাজেই হাসপাতালে যাওয়াটা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। আর অমনি রুটী, বিস্কুট, হালুয়া, কেক্, চপ্ প্রভৃতির ছবি দেখিতে লাগিলাম।...

কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানিনা হঠাৎ দেখিলাম একটা লোক আমার ঘরে প্রবেশ করিল। প্রথমে সে কোন ফেরী-ওয়ালা হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম এবং উপস্থিত ক্ষুধার হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই যাহা দেখিলাম তাহাতে এমন অবাক হইলাম যে, 'গোলদীঘিতে আগুন লেগে জল শুকিয়ে যাওয়া'তেও সেইরূপ আশ্চর্য্য বোধ করি নাই।—দেখিলাম আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জয়রাম! যাহাকে তখন হাসপাতালে দেখিতে যাইব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম এ সেই জয়রাম—সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে ধব্‌ধবে সাদা কাপড় পরিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া চাহিলাম। কিন্তু কোনই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না। সে একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া মুচকিয়া

হাসিতেছে। তাহার সে চেহারা নাই, তাহার সেই ভাঙ্গা পায়ের কোন চিহ্নই নাই। তাহার চোখে মুখে এক অপূর্ব্ব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে মুখে কোনরূপ দুঃখের চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয় যেন সে দয়াময়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছে। জগতের কোন দুঃখই আর তাহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ নহে।

আমি কিছুক্ষণ পরে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে, জয়রাম?

"হাঁ তাই, আপনাদের কাছে জয়রামই বটে।"

তাহার এইরূপ উত্তরে আরও বিস্মিত হইয়া বলিলাম—তুমি ত কাল হাসপাতালে পড়ে ছিলে, আর আজ এইরূপ অবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তোমার ঘায়ের ত কোন চিহ্নই দেখছি না, একেবারে সেরে গেছে?

"সে সব কথা হাপাতালে অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন। আমি সে সম্বন্ধে এখন কিছুই বলব না। আমার সময় অল্প। আপনাকে ভাল বলে জানি বলেই বিদায়ের এই শেষ মহূর্ত্তে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি।—ভাল কথা, একটা কথা রাখবেন?"

"কি কথা বল।"

"তেমন কিছুই নয়, তবু সেটাকে বলা দরকার বলে আমি মনে করি। কথাটা এই যে, কোন ফকিরকে ভিক্ষা দেন বা

না দেন, তাতে তেমন কিছুই যায় আসে না, তবে তাকে কখন ঘৃণা করবেন না বা কড়া কথা বলে তার মনে আঘাত দিবেন না ; এই আমার অনুরোধ।"

"কেন এমন কথা বলছো বল দেখি ? কখন আমি কোন ফকিরকে ঘৃণা করেছি, আর তোমার সঙ্গেই বা কখন খারাপ ব্যবহার করলাম ?"

"ছি, ছি ; রাগ করছেন কেন ? আপনি আবার কা'কে কখন ঘৃণা করলেন ? আমার সঙ্গেই বা কখন খারাপ ব্যবহার করতে গেলেন ? বরং আপনি ত আমাকে সাহায্যই করেছেন। তাই ত আপনার দয়ার কথা ভুলতে না পেরে বন্ধু হিসাবে দেখা করতে এসে এই কথাটা বললাম। এতে রাগ করলে চলবে কেন ? দেখুন আমার এই কথা বলার কারণ হচ্ছে এই;—আজ কাল অনেকেই ফকিরকে ঘৃণা করেন, এবং তাঁরা অর্থহীন (ধন হীন) লোককেই ফকির বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁরা একথা ভেবে দেখেন না যে জগতে প্রায় সকলেই ফকির। পৃথিবীতে কত রকমের ফকির আছে তা কে জানে ? কেহ ধনের ভিখারী, কেহ জনের, কেহ শক্তির, কেহ স্বাস্থের, কেহ বিদ্যার, কেহ জ্ঞানের, কেহ মনুষ্যত্বের, কেহ দয়ার, কেহ স্নেহের, কেহ প্রেমের,—ইত্যাদি কত রকমের যে ভিখারী আছে তা কি কেহ বলতে পারে ? কিন্তু নির্ব্বোধ মানুষ, ধন গর্ব্বে গর্ব্বিত ও কাণ্ডজ্ঞান হীন মানুষ সেই প্রথমটাকেই আসল

ভিখারী বলে মনে করে আর তাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকে।—আপনি হয় ত বলবেন যে, কে জ্ঞানের ভিখারী আর কে মনুষত্বের ভিখারী এগুলি ত দেখে চেনা যায় না, শুধু অর্থের ভিক্ষুক কেই তার ছেঁড়া ময়লা পোষাক দেখে চেনা যায়।—তার উত্তর হচ্ছে—মোহ। যদি এই মোহ না থাকত, যদি প্রত্যেক লোকই অপরের ভিতরের রূপটা দেখতে পেত, তাহলে মানুষ সংসারে টিকতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ মনুষ্যত্বের ভিখারীর কথাই ধরুন। এ জগতে শতকরা প্রায় নব্বই জন লোকই এই দলের ভিখারী। এই অবস্থায় তাহাদের পশু ভাবাপন্ন কলুষিত অন্তরের বীভৎস চেহারাটা যদি ঐ বাঁকী দশটা লোক দেখতে পেত, তা হলে সংসারের প্রতি নিশ্চয় তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মে যেত।—তাদের চেয়ে যারা কেবল ধনের ভিখারী, তাদের অবস্থা অনেক গুণ ভাল নয় কি? তা হলে লোকে কেবল ধনের ভিখারীকেই এত ঘৃণা করে কোন অধিকারে? এটা তাদের পক্ষে অন্যায় নয় কি?"

"হাঁ, তা—এক রকম অন্যায় বই কি! আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছ একটু বসবে না?"

"না আর সময় নাই, যাই এখন।" বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি তখন তাহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় আমার এক সহপাঠী বন্ধু ডাকিয়া বলিলেন, "কি হে—খুব যে ঘুমাচ্ছ দেখছি! এদিকে যে রুটী ওয়ালার হালুয়া-রুটী

টেবিলের উপরে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওগুলো টেবিলে খাবে না কি হে? (বন্দোবস্ত করা রুটীওয়ালা নিয়ম মত নাস্তা টেবিলে রাখিয়া চলিয়া যায়। কোন 'মিঞা' ঘুমাইয়া পড়িলে সে জাগাইতে সাহস করে না।) আমি ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"হাঁ ভাই, এই নাস্তার-চিন্তা করতে করতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

যাহা হউক হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিবার পর হাস-পাতালে গিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, জয়রাম ত তুনিয়াতে নাই তবে পদ্মায় অনুসন্ধান করিলে তাহার মৃত দেহটা পাওয়া যাইতে পারে।

বাস্তবিকই শুনিয়া মন কেমন করিয়া উঠিল। চোখে তুই ফোটা জল দেখা দিয়াছিল কি না জানিনা, তবে মনে বেশ কয়েক ফোটা জমিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ফুলার হোষ্টেল, রাজসাহী
ইং ২৩।৭।৩০



মৃত্যু

সবেমাত্র স্কুলের ছুটি হইয়াছে। তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারিটা। ছেলেরা আপন আপন সঙ্গীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে, অতি বিশৃঙ্খল ভাবে। এতক্ষণ যেখানে কদাচিত দুই একটা ছেলে দেখা যাইত, এখন সেখানে ছেলেদের হাট লাগিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লাল পিপ্ড়ার বাসায় হঠাৎ খোঁচা দিলে যেরূপ অবস্থা হয়, ইহা কতকটা ঠিক সেইরূপ।

বোর্ডিং-এ আসিয়া দেখি, একদল ছেলে ফুটবল বাহির করিয়া ‘শট্’ করিতেছে, একদল ‘ব্যাট-মিণ্টনের’ নেট্ (জাল) টাঙ্গাইতেছে, আর একদল মার্ব্বল লইয়া ‘[illegible]থিং, ভিষ্টো ওয়ান টাইম’ প্রভৃতি স্বুরু করিয়া দিয়াছে এবং কেহ কেহ নাস্তায় মনোনিবেশ করিয়াছে।

ঠিক সেই সময় নিজ কামরায় প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখিলাম, সম্মুখেই নর্দ্দমায় একটা মরা কোকিলের বাচ্চা পড়িয়া আছে, আর তাহাতে কতকগুলি পিপ্ড়া লাগিয়াছে। আমি উহা কোথা হইতে আসিল মালীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কোন সদুত্তর দিতে পারিল না। পরে তাহাকে উহা ফেলিয়া দিতে বলায় সে উত্তর করিল, “রাহ্নে দিজিয়ে বাবু, মেহ্তর আকে উঠাকে ফেক দেগা, হাম নাহি সেকেঙ্গে।”

—আমি পাছে ঐ মৃত দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতে পারে ভাবিয়া সেটাকে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

সেদিন একটা ফোড়ার বেদনায় শরীর অত্যন্ত খারাপ করিতেছিল এবং একটু জ্বরও আসিয়াছিল। তাই বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ঐ মৃত কোকিল ছানা সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে বেশ একটু তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ শুনিতে পাইলাম কে যেন মিহি গলায় আমাকে ডাকিতেছে। আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু কোথাও কিছু দেখা গেল না। ইহাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্যবোধ করিলাম, এবং উহা কাহার কণ্ঠস্বর হইতে পারে চিন্তা করিতে লাগিলাম। —আবার শব্দ হইল, "ও মশায়, আপনার জানালার দিকে চেয়ে দেখুন না!"

আমি জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলাম—ছোট একটী পাখী, হাঁ—শুধু ছোট পাখী কেন, একটা কোকিলছানা, সবে মাত্র উড়িতে শিখিয়াছে বলিয়া মনে হয়, আমার জানালার কপাটের এক কোণে বসিয়া আমাকে ডাকিতেছে!

আমি জানি যে তোতা পাখী, টিয়া, ময়না প্রভৃতি পাখীগুলিই কথা বলিতে পারে, তাহাও আবার শিক্ষা দিলে; আর এই কোকিল ছানা স্বচ্ছন্দে মানুষের মত কথা বলিতেছে কিরূপে? তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বলত, তুমি কথা বলা শিখ্‌লে কিরূপে, আর কার বাড়ীতেই বা থাক?

উত্তরে সে বলিল, "দেখুন, আমি কারও বাড়ীতে থাকি না। আমি থাকতাম—এই নিম গাছের এক ডালে কাকের বাসায়। ছোট বেলায় ত তারা খুবই আদর করতো, কিন্তু আজ দুই তিন দিন হ'তে তারা আমাকে সন্দেহ করে আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছিল। যাক্, দয়াময় আমাকে সে কষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েচেন। এখন আমি সংসারের সকল বাঁধন কেটে মুক্ত। তবে মরবার সময় একটু কষ্টই হয়েছিল।— না, আর সে সব দুঃখের কথা তুলে বৃথা সময় নষ্ট করব না।— হাঁ, এই কি বলছিলেন যেন—কথা শিখ্লাম কার কাছে? —তা আর বুঝলেন না, এখন যে আমি মুক্ত, সংসারের কোন বাঁধনই মানি না। এখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারি, যে কোন মূর্ত্তি ধরতে পারি, যে কোন ভাষায় কথা বলতে পারি! কোকিল মূর্ত্তি ধরলাম কিজন্য? আপনার চিনবার সুবিধা হবে বলে। আপনি আজ যে মৃত দেহটা ফেলে দিয়েছেন সেটা আমারই দেহ।"

"আচ্ছা বল দেখি, তুমি আমার নাম জান্‌লে কি করে?"

"এটা ত তেমন কঠিন কাজ কিছুই নয়। প্রতিবেশীর নাম জান্‌তে আর কত সময় লাগে? ভাল কথা, আমার নামটাও জেনে রাখুন। আমার নাম হচ্ছে—'টু'। বেশ নামটী, কি বলেন?"

আমি—হাঁ, নামটী ত ভালই।— আচ্ছা টু, তোমাকে কি দোষে তারা মারপিট করলো?

টু—সে কথা আর বলবেন না। আমার চেহারা দেখে তাদের পূর্ব্বেই সন্দেহ হয়েছিল। এ জগতে দুষ্ট লোকে পরের অনিষ্ট করবার ফন্দি খুব সহজেই বের করতে পারে। তাই তারা আমাকে মারবার ছলে এক নূতন ফন্দি আঁটলো! ধেড়ে কাকটা এসে আমাদের ডেকে বললো, "গ্যাখ বাছারা, তোরা এখন বড় হয়েছিস, এখন একবার ডাক দিকিন কে কি রকম ডাকতে পারিস্ দেখি!" এই কথা শুনে ত কাকের বাচ্চারা এক সঙ্গে ডেকে উঠলো—"কা—কা—কা," আর আমার এই লক্ষ্মীছাড়া গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো—'কু—উ—'। তারপরেই ত তারা সবাই ঘিরে ফেললো আমাকে! আমি প্রথমে মনে করলাম বোধহয় আমার আওয়াজটা খুব মিষ্টি লেগেছে তাই তারা আমাকে আদর করছে। কিন্তু হায়! আদরের মাত্রা এমন চরমে উঠ্লো যে আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা! আমি তার আগে কোন দিন উড়িতে চেষ্টা করিনি। কিন্তু তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না। সেই অত্যাচারে জর্জ্জরিত দুর্ব্বল শরীর নিয়ে উড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বেশী দূর যেতে হলো না। শরীর অবশ হ'য়ে এলো, মাথা ঘুরে উঠলো, চোখে সারা পৃথিবী অন্ধকার দেখলাম! অমনি ঘুরতে ঘুরতে আপনাদের নর্দ্দমায় পড়ে গেলাম। সেই নর্দ্দমায় জল ছিল। শুধু বুঝতে পারলাম যে, আমার মাথা জলে পড়েছে আর নিশ্বাস নিতে না পারায় ভয়ানক কষ্ট

হচ্ছে! তারপর আর কিছু জানি না।—পরে যখন জ্ঞান হ'ল তখন আমার বেশ 'ফুর্ত্তি' লাগছে, ক্ষুধা পিপাসা কিছুই নাই! আমি এক সুন্দর জীবন পেয়েছি। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। আমি এখন খুব সুখী। আপনি আমার মৃত দেহটার সদগতি করেছেন বলে আপনাকে মৃত্যু সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলবো। আপনি মানুষ, শ্রেষ্ঠ জীব। তাই বলে আমাকে অবজ্ঞা করবেন না। মনে রাখবেন, অনেক সময় ক্ষুদ্র হ'তেও বড় জিনিষ লাভ করা যায়।

আমি—বেশ, তোমার যা বলবার আছে বলে যাও। তোমার কথা শুনে কোন ক্ষতি ত আমার হচ্ছে না, বরং কিছু লাভও হ'তে পারে।—আর দেখ, আজ আমার শরীরটা খারাপ করছে। আমি উঠে বসতে পারবোনা। তুমি ওখান থেকে নেমে এসে আমার মাথার কাছে এই টেবিলটার উপরে বস। তাহলে আমাদের দুইজনেরই সুবিধা হবে।—এই কথা বলায় সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আপন বক্তব্য সুরু করিয়া দিল।

টু—আপনি বলিতে পারেন মৃত্যু জিনিষটা কি ?

আমি—এটা আর এমন শক্ত কথা কি? কোন প্রাণীর জীবনের দিন ক'টা যখন ফুরিয়ে আসে তখনি তার মৃত্যু হয়। আর মৃত্যু হইলেই ত তার সব শেষ হয়ে যায়, এ—ত—সবাই জানে!

টু—না, না, আপনি তাহলে ঠিক জানেন না। মানুষ সাধারণ বুদ্ধিতে মৃত্যু সম্বন্ধে যা বলে আপনি ঠিক সেই

কথাগুলোই বলে গেলেন। কিন্তু আসল কথাটা কি তা আর ভেবে দেখলেন না।

আমি—বেশ, আমি না হয় জানিনা; তুমিই তাহলে বলে দাও। যদি তোমারটাই সত্য বলে মনে হয় তবে চিরকাল মনে করে রাখবো।

টু—শুনুন, এই সংসাররূপ কঠিন যুদ্ধক্ষেত্রে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করার পর জীবের আত্মা বড় ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম চায় ঠিক সেই সময় যদি তার নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি শেষ হয়ে থাকে তবেই সে চিরবিশ্রামের দেশে প্রস্থান করে। আর এই চিরশান্তিময় মহাপ্রস্থানকেই আমরা মৃত্যুরূপ বিভীষিকাময় কাল্পনিক দৃশ্যে পরিণত করি।

আমি—তা না হয় হল। কিন্তু আত্মাকে আজরাইল (যমে) নিয়ে যায় কেন? আর তাতে ত আত্মা অনেক কষ্টও পায়!

টু—বেশ, মনে করুন, আপনি এক দূর দেশে গিয়েছেন আপনার পিতার আদেশে কতকগুলি দরকারী কাজ সারার জন্য। সেখান থেকে যখন বাড়ীতে ফিরবেন তখন নিশ্চয় আপনার একটা বাহনের দরকার হবে, সেটা গাড়ী, ঘোড়া বা ট্রেন যাই হোক না কেন। তবে আপনি বলতে পারেন, 'আমি শক্তিশালী পুরুষ আমার কোন গাড়ী ঘোড়ার দরকার হবে না, আমি হেঁটেই যাব।' তা আপনি স্বচ্ছন্দেই যেতে পারেন। কিন্তু পথে যদি একটা খুব বড় নদী বা সমুদ্র থাকে,

তখন ত আপনাকে নৌকা বা ষ্টিমারের আশ্রয় নিতেই হবে! তখনি একটা বাহনের দরকার হল। তেমনি, এই সংসার ও পরপারের মাঝখানে যে ভীষণ রাস্তা আছে তার একমাত্র বাহন হচ্ছে আজরাইল। তাই আত্মাকে যমের হাতেই যেতে হয়।—আর যে কষ্টের কথা বললেন তার কারণ হচ্ছে—প্রথমতঃ একটা জায়গায় বেশীদিন ধরে থাকলে সেই জায়গার উপর একটা মমতা জন্মে যায়। তারপর হঠাৎ সেই জায়গাটা ছেড়ে যেতে প্রাণে স্বভাবতঃই ব্যথা লাগে। আর এই সংসার—যে সংসার প্রাণীকে স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি সহস্র বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে,—সেই সংসার ত্যাগ করে যেতে কার প্রাণে না দুঃখ হয়, বলুন দেখি?

আমি—তুমি বললে মৃত্যু হয় আত্মার বিশ্রামের জন্য। তা হলে মানুষ পরকালে শাস্তি পায় কেন?

টু—হাঁ, একথা সত্য। কিন্তু শাস্তি ত সকলেই পায় না! শাস্তি পায় শুধু তারাই, যারা জগতে আপন কর্ত্তব্য পালন করে না ও সেই বিশ্বপিতার সামনে হিসাব নিকাশ দিতে পারে না। পূর্ব্বেই ত বলেছি যে আপনি দূর দেশে গিয়াছেন আপনার পিতার আদেশে কোন কাজে। তার পর যখন বাড়ীতে ফিরে এসে আপনার পিতার সামনে জমা খরচের খতিয়ান দিতে না পারবেন, আর যখন তিনি জানতে পারবেন যে, আপনি নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন নি বরং কুসঙ্গে মিশে কেবল স্ফূর্ত্তি উড়িয়ে

কু-কাজে মত্ত হয়ে দিন কাটিয়েছেন, তখন কি তিনি আপনার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না? আপনাকে কি এর জন্য শাস্তি দিবেন না? নিশ্চয় দিবেন। এমনকি আপনার অপরাধ গুরুতর হলে আপনাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিতেও পারেন। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আপন আপন কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হবে। সৎ কাজের জন্য পুরস্কার আর অসৎ কাজের জন্য দণ্ড ত আছেই, এ আর নূতন কথা কি?

আমি—তবে কেহ শৈশবে আর কেহ বুড়া হয়ে মরে কেন? আর ছোট ছেলেদের হিসাব দিতে হয় না কেবল বড়দের বেলাই হিসাব নিকাশের মারা মারি কেন?

ট্—তার কারণ হচ্ছে এই,—মনে করুন আপনি সেই দূর দেশে কাজ করছেন। আপনার কাজ শেষ না হলে ত আর বাড়ী ফিরে যেতে পারেন না; তা সে যত দিনই লাগেনা কেন। এর মধ্যে হয় তো আপনার মেজ ভাই ও ছোট ভাই বেড়াতে এল। ছোট ভাই, সে শুধু বেড়াতেই এসেছে; এক দিন পরেই বাড়ী ফিরে যাবে। আর মেজ ভাই এসেছে দু এক সপ্তাহ থেকে আপনার কাজ অনেকটা আগিয়ে দিতে। তার পরেই সে বাড়ী ফিরে যাবে। এখন দেখুন, ছোট ভায়ের কোন কষ্ট নাই। সে আরামের সঙ্গে এল আর আরামের সঙ্গে ফিরে গেল। তাকে কোন হিসাব দিতে হবে না। মেজ ভাই এল কতকটা কাজের ভার মাথায় নিয়ে, আর গেল—কাজের

হিসাব নিকাশের কথা ভাবতে ভাবতে। আর বড় ভাই বেচারীর কথা না বললেও চলে। আপনি যে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন এও ঠিক তেমনি।

আমি—আচ্ছা, বলতে পার আত্মহত্যা করাতে পাপ হয় কেন?

টু—বেশ, মনে করুন আপনি সেই দূর দেশেই আছেন, আর আপনাকে অনেকগুলি কাজ শেষ করতে হবে। এমন সময় আপনি বুঝতে পারলেন যে সেই সমস্ত কাজ শেষ করতে হলে অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। এই না জেনে, ভয়ে কাপুরুষের মত কাজগুলি ফেলে রেখে সটান্ সেখান থেকে সরে পড়লেন। পর দিন হঠাৎ একেবারে বাড়ী গিয়ে হাজির! যখন আপনার পিতা সকল কথা জানতে পারবেন, তখন তিনি আপনার উপর সন্তুষ্ট হবেন না বিরক্ত হবেন বলুন দেখি? ঠিক সেই কারণে আত্মহত্যা করা পাপ বা দোষের কাজ।

আমি—শুধু মানুষকে কেন হিসাব নিকাশ দিতে হয়, অন্যান্য প্রাণীদেরই বা খতিয়ানের দরকার নাই কেন?

টু—দেখুন, মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। যত সব দায়ীত্বপূর্ণ কাজ তাদেরই হাতে। এ জন্যই তাদের খতিয়ানের দরকার। যেমন মনে করুন, আপনার এষ্টেটের ভার ম্যানেজারের হাতে। তার অধীনে অনেক পাইক, পিয়াদা, গোমস্তা, দফাদার প্রভৃতি কাজ করে। এখন সেই এষ্টেটের

আয় ব্যয়ের জমা খরচ আপনি সেই ম্যানেজারের নিকট থেকে নিবেন, না সমস্ত পাইক বরকন্দাজের নিকট হতে? নিশ্চয় বলবেন, ম্যানেজারের কাছে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই রকম। সর্ব্বশক্তিমান জগতপিতা শুধু তাঁর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের নিকট হতেই হিসাব নিকাশের খতিয়ান তলব করবেন।—ভাল কথা, বলুন ত কেহ মরে গেলে তাকে কি করে?

আমি—হয় তাকে কবর দেয়, না হয় পুড়িয়ে ফেলে। যার শাস্ত্রে যেরূপ বলে সে সেরূপ করে।

টু—উঁ-হু,-এটা আপনাদের একটা মস্ত ভুল ধারণা। কা'কেও কেউ কখন কবর দিতে বা পুড়িয়ে ফেলতে পারে না।

আমি—সে কি রকম? বেশ করে বুঝিয়ে বল, না হলে আমি মোটেই বুঝতে পারছি না।

টু—বেশ, মনে করুন আপনার একটা ঘড়ি আছে। একদিন কেউ এসে বেশ চালাকির সাথে ঘড়ির কাঁটা আর তার বাহিরের খোলসগুলো রেখে দিয়ে, কলকব্জা যা কিছু সমস্তই বের করে নিয়ে চুপ করে সরে পড়লো। আপনি ঘরে এসে দেখেন ঘড়ি বন্ধ! কোন রকমেই আর তাকে চালাতে পারলেন না। তখন রাগ করে সেই খোলাটা ফেলে দিয়ে এলেন। এখন আপনি মনে করতে পারেন যে, আপনি ঘড়িটা ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? তা কখনই নয়। মূল জিনিষটা ত যে নিয়েছে তার কাছেই রয়ে গেল। এখন সে চাবি দিলেই

সেটা টিক্ টিক্ করে চলতে থাকবে। ঠিক সেই রকম আত্মা আপনার জায়গায় চলে যায়। তার কখন ও ধ্বংশ নাই। আপনারা সৎকার করেন তার ক্ষণভঙ্গুর অপবিত্র দেহটার। যে দেহটার কোন মূল্য হয় না। এখন বুঝতে পেরেছেন ত?

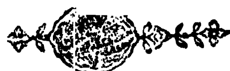
আমি—আচ্ছা বলত আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখ হয় কেন?

টু—দুঃখ হয় কেন? তার কারণ হচ্ছে মায়া, যেমন মনে করুন, আপনার এক আত্মীয় কোনও শুভ কাজে, নিজের উন্নতির জন্য কোন এক দূর দেশে যাচ্ছেন। সেখানটায় একবার গেলে জীবনে আর ফিরবেন না বা চিঠি পত্রও দিতে পারবেন না। সেখানে গেলে আপনাদের সঙ্গে তাঁর চির, বিচ্ছেদ হবে। এস্থলে আপনারা তাঁকে বিদায় দিতে নিশ্চয় দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। কেহ কেহ আবার মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ চোখের জলও ফেলেন। (আমি অনেক হজ্জ যাত্রী ও তাঁদের আত্মায় স্বজনকে বিদায় বেলায় কাঁদতে দেখেছি।) মৃতের জন্য দুঃখও ঠিক সেই রকম। কিন্তু মনে মনে দুঃখ করাটা অন্যায় না হলেও সেটা বাহিরে প্রকাশ করা বড়ই অন্যায়। কারণ সেই বিদেশ যাত্রী যদি জানতে পারে যে তার জন্য আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, তা হলে তার মনের উৎসাহ অনেকটা কমে যায়। আর সেখানে গিয়াও সে কিছুতেই মনে শান্তি পায় না। আত্মার বেলায়ও ঠিক সেই অবস্থা।......

আমি আর ও কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম এমন সময় সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল—দেখুন, আপনার ঘরে কে যেন ঢুকছে। আমি আর থাকতে পারবো না; তাহলে যাই এখন। এই কথা বলতে বলতে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই আমার ছোট ভাই মাহতাবের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিলে উঠিয়া দেখি সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, অধিকাংশ ছেলেই পড়িতে বসিয়াছে বা বসিবার আয়োজন করিতেছে। সেকেণ্ড মৌলবী সাহেব মগরেবের (সন্ধ্যার) নামাজ শেষ করিয়া নিজের ঘরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "সন্ধ্যার সময় ঘুমাচ্ছ কেন, কোন অসুখ বিসুখ হয় নাই ত ?"

"হ্যাঁ সার, একটু জ্বর জ্বর ভাব হয়েছে তাই শুয়েছিলাম" বলিয়া বাহিরে গেলাম। পরে হাত মুখ ধুইয়া পড়িতে বসিলাম। কিন্তু পড়াশুনায় মন দিব কি, কেবলি সেই স্বপ্নের কোকিল ছানার কথা মনে হইতে লাগিল! আর ভাবিতে লাগিলাম—কথাগুলির কি কোনই মূল্য নাই !

মালদহ বোর্ডিং
ইং ৭।১১।২৯



পাগল

নাম ছিল তাহার নেজামউদ্দিন। কিন্তু মাথায় একটু গোলমাল থাকায় গাঁয়ের লোকে তাহাকে নেজাম পাগলা বলিয়া ডাকিত। সে আপন ইচ্ছামত চলে, কাহারও বড় একটা তোয়াক্কা রাখে না, যখন যেখানে খুসী যায়, হাতে একটা মস্ত বাঁশের লাঠি, মাথায় কোঁকড়ান বাব্‌রী, পরণে সাত তালি দেওয়া ময়লা কাপড়, গায়ে একটা সেই কাপড়ের উপযুক্ত কোর্ত্তা, ঘাড়ে একটা ছেঁড়া কম্বল, কোঁচার সম্মুখ দিকে অনেক গুলো পুঁটলী, সেই সমস্ত পুঁটলীতে ইট, পাথর, কাঁচ প্রভৃতির ছোট ছোট টুকরা, মুখে চাপ দাড়ী, কোঁকড়ান ও লম্বা,—এই নেজামের সাজ! যেদিন যাহার বাড়ীতে ইচ্ছা সে পড়িয়া থাকে। গৃহকর্ত্তা দয়া করিয়া ছুইটী ভাত দিলে সে বেশ সন্তুষ্ট হয় ও আপন মনে হাসিতে হাসিতে সেগুলি খায়; আর ভাত না দিলে সে সেখানে বসিয়া তাহার চৌদ্দ বা তদূর্দ্ধ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে থাকে। তাহার মেজাজটা বড় রোখা। তাই গ্রামের ছেলেরা তাহাকে বিরক্ত করাটা নিরাপদ বলিয়া মনে করে না। যদিও ছুই একটা বখাটে ছেলে তাহার নাগালের বাহিরে কোন ছুর্গবিশেষের আড়াল হইতে তাহাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করে।

নেজাম এখন অসহায় হইলেও পূর্ব্বে নাকি তাহার অবস্থা মন্দ ছিল না। —কয়েক বিঘা জমি, হাল, গরু, বাছুর, সবই তাহার ছিল। তাহার সুন্দরী স্ত্রী ছিল কিন্তু কোন ছেলে হয় নাই। স্ত্রীকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং শুনা যায় এই স্ত্রীই নাকি তাহার পাগলামির প্রধান কারণ। তাহার পাগলামি সম্বন্ধে যে কয়টা প্রবাদ বাক্য শুনা যায় তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটীই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়।—

বৈশাখ মাস। খাল, বিল, নালা, ডোবা, পুকুর, প্রভৃতি যেখানে যাহা ছিল সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছে। এমন সময় প্রত্যেক বৎসরই বিলে মাছ মারিবার খুব ধুম পড়িয়া যায়, এবারও পড়িয়াছে। প্রতিদিন এক একজন নাকি বিশ পঁচিশ সের মাছ মারিতেছে। ইহা শুনিয়া নেজামেরও মাছ মারিবার সখ প্রবল হইয়া উঠিল। সে একদিন ভাত খাইয়া সকালেই অনেকগুলি চিড়া ও গুড় গামছায় বাঁধিয়া, স্ত্রীকে আদর করিয়া সাবধানে থাকিতে বলিয়া, তাহার সখের পলইটা (মাছমারা একপ্রকার যন্ত্র. বাঁশের তৈরী) লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর সমস্ত দিন বিলের মধ্যে একা ঘুরিয়া বিফল মনোরথ হইয়া বৈকালে দুঃখিত মনে ও ক্লান্ত শরীরে এক গাছের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িল। —স্বপ্নে সে আপন প্রিয়তমা স্ত্রীকে পর-পুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রেমালাপ করিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর তাহার মাছ মারা হইল না। সে তখনি বাড়ীতে

পৌঁছিয়া অনুসন্ধানে যখন জানিতে পারিল যে তাহার স্ত্রী চরিত্রহীনা, তখন সে জগৎ অন্ধকার দেখিল। জীবন তাহার পক্ষে দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। সে তাহার স্ত্রীকে ত্যাগ করিল, এবং সমস্ত সম্পত্তি সেই স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিয়া সে পাগল হইয়া গেল।

বাস্তবিকই উপরোক্ত ঘটনাটা সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ এখনও সে "তোর ভাল হবে না। আমাকে কষ্ট দিয়ে তুই কি সুখে থাকবি? তা কখনই থাকবি না। আমি তোর কি অনিষ্ট করেছিলাম..." ইত্যাদি বলিয়া প্রলাপ বকিতে থাকে, আর সময়ে বিকট রবে হাসিয়া উঠে।...

কয়েক মাস পরে নেজামকে টাউনে (রাজসাহীতে) দেখা গেল। বৈকালে পদ্মার ধারে ধারে বেড়াইয়া যখন হোষ্টেলের দিকে ফিরিয়া আসিতেছি, সেই সময় কেহ যেন আমাকে ডাকিল "ও মশায়, ও—ভদ্রলোক, শুনছেন?" পিছনে ফিরিয়া দেখি—নেজাম! তাহাকে একটু চিনিতাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "নেজাম, তুমি এখানে এলে কি করে?"

সে বলিল, "কেন, রেলগাড়ীতে চড়ে এসেছি।"

"টিকিটের পয়সা পেলে কোথায়।"

"কানা খোঁড়ার কি পয়সা লাগে? আমি ত এখন খোঁড়া হয়েছি, দেখছেন না?" এই কথা বলিয়া সে তাহার ডান পায়ের হাঁটু দেখাইল। দেখিলাম সত্যই সেখানে একটা বড় ঘায়ের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে।

"আচ্ছা, তুমি গ্রাম ছেড়ে চলে এলে কেন ?"

"গাঁয়ে আবার ফিরে যাব, তবে একটা কাজের জন্য এখানে কয়েক দিন থাকতে হবে।"

কি কাজ, জিজ্ঞাসা করায় সে চারিদিকে একবার লক্ষ্য করিয়া খুব সাবধানে আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আমি আবার বিয়ে করব, তার জন্য সোনারকে এক সের সোনা কিনে দিব। তার পর গয়নাগুলো গড়ান হলে একেবারে নিয়ে থুয়ে বাড়ী চলে যাব।"

"তুমি যে অতগুলো সোনা কিনবে তার টাকা কৈ ?"

এই কথা শুনিয়া সে খুব জোরে হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কত টাকা লাগবে ? লাখ, দু'লাখ বৈ ত নয়, তার জন্য চিন্তা কি ?" তাহার পর সে তাহার কোঁচার সম্মুখের ঝুলান পুঁটলীগুলি দেখাইয়া বলিল, "দেখ, এই পুঁটলীগুলোতে কি আছে বল দেখি ?"

"তোমার পুঁটলীতে কি আছে, কি না আছে তা আমি কেমন করে বলবো ?"

সে হাসিয়া বলিল, "হাঁ, ঠিক বলেছ, এ সমস্ত কিম্মতি (দামী) জিনিষের কথা তোমরা বলবে কেমন করে। এসব থলেতে (পুঁটলীতে) আছে হীরা, জহরৎ আর 'নম্বরী নোট' বুঝলে ?

"হাঁ, তা ত বুঝলাম, কিন্তু নম্বরী নোট-টা কি জিনিষ ঠিক বুঝতে পারছি না। ওটা কি রকম ?"

নেজাম—নম্বরী নোট চিন না ? এগুলো হচ্ছে খুব দামী নোট। বিদেশে যেতে হলে অনেকগুলো টাকা পয়সা সঙ্গে নিলে খুব ভার বোধ হয়, এবং তাতে পথে চলার বড় অসুবিধা হয়। তাই বড় লোকেরা টাকা পয়সার বদলে নম্বরী নোট ব্যবহার করে।

আমি—আচ্ছা, ওগুলির দাম কত ?

নেজাম—সব রকমই আছে। শও, হাজার, লাখ টাকা দামেরও আছে আবর দুআনা চার আনা দামেরও আছে।

এই কথা বলিয়া সে খুব সাবধানে তাহার একটা পুঁটলী খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে এক টুকরা নীল রংএর কাঁচ বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ, এই একটা খুব কিম্মতি নোট। আমি খুসি হয়ে আপন ইচ্ছায় তোমাকে এটা দিচ্ছি। 'ঠিক মত চালাতে পারলে' এর দাম কম করে ধরলেও দশ হাজার টাকা হবে।"

আমি কোন রকমে হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম, "আমি ও নোট নিয়ে কি করবো ? বিনা পয়সায় নিতেই বা যাব কেন ? আর নিয়ে ওটাকে চালাবই বা কোথায় ? তার চেয়ে ও দামী নোট তোমার কাছেই থাকুক। তুমি সব সময় রাস্তা ঘাটে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ওটা তোমার কাছে থাকলে সময়ে অনেক কাজে লাগবে।"

এই কথা শুনিয়া সে বলিল, "আচ্ছা থাক। তার-পর

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন চিন্তা করিল। পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "হাঁ ভাই তোমার বিয়ে হয়েছে ?"

আমি—না এখনও হয়নি, কেন ?

নেজাম—এ্যাঁ, তুমি এত বড় হয়েছ তাও তোমার বিয়ে হয়নি ? (তাহার আশ্চর্য্য হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। বরেন্দ্রের লোক শিক্ষার অভাবে এতদূর অধঃপাতে গিয়াছে যে, বিবাহকেই তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া মনে করে এবং সুযোগ পাইলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহ দিতেও ইতস্ততঃ করে না। কেহ কেহ আবার গর্ভস্থ সন্তানের বিবাহের চুক্তিতেও আবদ্ধ হইয়া থাকে। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য !)

আমি—হাঁ, সত্য সত্যই হয়নি। কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ?

নেজাম—না—তা—নয়—।...আচ্ছা আমি যদি তোমার জন্য একটা লাল টুক টুকে পাত্রী ঠিক করি, তাহলে পছন্দ হবে ত ?

"আমার পাত্রী তুমি ঠিক করতে যাবে কেন ? আমার বাবা, মা, ভাই, বোন, সকলে বেঁচে থাকতেও কি অন্যে পাত্রী ঠিক করে দিবে ?"

নেজাম অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া বলিল, "বেশ, তোমার যখন বিয়ে হবে তখন আমাকে একটা চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করো। তোমার বৌকে একটা নম্বরী নোট যৌতুক দিব। সেটা লাখ টাকা দামেরও হতে পারে বুঝলে ?

আমি—বেশ, যখন আমার বিয়ে হবে তখন্ দেখা যাবে। আজকের মত তুমি যাও। সন্ধ্যা হয়ে এল, আমিও হোষ্টেলে যাই।

নেজাম—হাঁ ভাই তোমাদের হোষ্টেলে আমাদের থাকতে দিবে না ?

আমি—না, এটা গভর্ণমেণ্টের হোষ্টেল। এখানে ছাত্র ছাড়া কোন বাজে লোককে থাকতে দেওয়া হয় না।

নেজাম—বেশ, আমি থাকতে চাই না, কেবল তোমাদের হেষ্টেলটা দেখব চল।

"দেখবে যখন, তখন এস," বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া হোষ্টেলে আসিলাম। তারপর তাহাকে হোষ্টেল, ইন্দারা, পাকের ঘর, খাবার ঘর প্রভৃতি দেখাইয়া অবশেষে বিদায় দিলাম। পরে নিজের ঘরে যাইয়া সন্ধ্যার নামাজ শেষ করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া পড়িতে বসিলাম।......

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহর অনেক বিষয়ে উন্নত। এইরূপ উন্নত স্থানে যে কেহ বাস করিতে আসে সেই উন্নতি লাভ করে। যাহার যে ব্যবসায় সে সেই ব্যবসায়ে লাভবান হয়। অতএব আমাদের নেজামের পাগলামিও যে উন্নতিলাভ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

নেজামের পাগলামি খুব দ্রুত গতিতে উন্নতি-লাভ করিতে লাগিল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই নেজাম উদ্দিন পাগল শ্রেণীতে

প্রথম স্থান অধিকার করিল। সে তাহার ভাবী স্ত্রীর জন্য সোনারের দোকানে অলঙ্কারের বায়না দিবার কথা ভুলিয়া গিয়া, তাহার বহুমূল্য মণি, মুক্তা, নম্বরী নোট প্রভৃতি কোঁচায় ঝুলাইয়া টাউনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু এখন আর সে একা থাকে না। কোন স্থানে সে যাওয়া মাত্র তাহার অনেকগুলি ভক্ত জুটিয়া যায়, এবং তাহারা নানারূপ গোলমাল আর চীৎকারে সে যায়গাটা মুখরিত করিয়া তাহার মত বড় লোকের অস্তিত্ব সকলকে জানাইয়া দেয়। সে তাহার ভক্তদিগকে যথাসাধ্য গালাগালি ও প্রহারের ভয় প্রদর্শন করা স্বত্বেও তাহারা অসন্তুষ্ট, বিরক্ত বা ভীত হয় না ; বরং হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করে এবং নেজামের রাগ দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে এই অল্পদিনের মধ্যেই এই সহরের প্রায় সকলের পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে ; এবং খুব সতর্ক থাকা স্বত্বেও তাহার মণিমুক্তার কথা অনেকেই জানিয়া ফেলিয়াছে। তাহার লাঠি কম্বল ও সেই মূল্যবান (?) পুঁটলীগুলি তাহার অনেক ভক্তের চক্ষেই বেশ লোভনীয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে ; এবং তাহারা একটু সুযোগ পাইলেই সেগুলি হস্তগত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত সেই হতভাগ্যদের কাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

নেজামের চোহরার ও বেশ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

তাহার দাড়ি ও চুল যেন পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিল। তাহার শরীর—অনিয়ম, অনাহার, অনিদ্রা, অশান্তি ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের (ভক্তদের সঙ্গে অবিরাম ঝগড়ার) ফলে দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। দেখিলে মনে হয় যেন দুই দিন পরে আর একটু শুকাইয়া হাল্কা হইলে, সে আর মাটিতে পা দিয়া হাঁটিবে না, একেবারে পাখীর মত উড়িতে সুরু করিবে। তাহার কাপড়গুলি ময়লার গণ্ডী ছাড়াইয়া এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে যে, কোন ধোপাই আর তাহাকে পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে না। এখন তাহার পুঁটলিগুলিও বেশ বড় হইয়া উঠিল। কারণ রাজসাহীর পথে ঘাটে সেইরূপ মনিমুক্তা ও নম্বরী নোটের অভাব হয় না। তবে দুঃখের বিষয়, আমাদের মত সাধারণ লোকে সেগুলির মর্য্যাদা বোঝে না।

নেজামউদ্দিন এখন গান গাওয়া, ঝগড়া করা, চেঁচান প্রভৃতি ছাড়া আরও অনেক কাজের কথা বলিয়া থাকে। সে বলে যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাহার মাসতুতো (খালাতো) ভাই, ভারতের আট আনা অংশের সেই প্রকৃত মালিক, তবে সম্রাট নাকি অন্যায় উপায়ে তাহাকে ফাঁকি দিয়া তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন! কলিকাতায় তাহার দাদার (ঠাকুরদাদার) সাত তলা বাড়ী, পঁচিশটা হাতী, আমলা, সিপাহী, গোমস্তা, বরকন্দাজ, ধনদৌলত সবই ছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সে সমস্তই অন্যায় ভাবে বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন!

সে ইচ্ছা করিলে 'হাইকোর্ট' পর্য্যন্ত 'মোকর্দ্দমা' করিয়া সেগুলি উদ্ধার করিতে পারে এবং গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ রূপে জব্দ করিতে পারে! তবে গভর্ণমেণ্টের বিশেষ সৌভাগ্য, তাহার আর সে সম্পত্তিতে মোটেই লোভ নাই। কারণ বর্ত্তমানে তাহার যে সম্পত্তি আছে তাহার আয় হইতেই অনেক অসহায় পরিবার প্রতিপালিত হয়।—ইত্যাদি ·····

একদিন যখন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি এবং হোষ্টেলে নিজ ঘরে ঢুকিতে যাইতেছি, তখন বাবুর্চিখানার দিকে একটা গোলমাল হইতেছে বলিয়া মনে হইল। অমনি তাড়াতাড়ি বইগুলি রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু পাক ঘরে যাইবার আর দরকার হইল না। সম্মুখেই একজন সহপাঠীকে দেখিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "আরে দূর্, কোথাকার এক পাগল এসে পাকঘরের বারান্দায় বসেছে। বাবুর্চিরা তাকে সেখান থেকে যেতে বলায় সে গালাগালি দিচ্ছে আর মারতে উঠছে।"

আমি বলিলাম, "চল, একটু মজা দেখা যাক।"

তিনি বলিলেন—হ্যাঁ, মজা না ছাই দেখবে, ও পাগলের পাগলামি দেখে কি লাভ হবে? তার চেয়ে চল একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।

আমি— না আজ আর বেড়াতে যাব না, তোমার ইচ্ছা হয়ে থাকে তুমি যাও।—এই কথা বলিয়া হোষ্টেলের ছাদে

উঠিলাম। কারণ এই ছাদ হইতে চারিদিকে অনেক কিছুই দেখা যায়। ছাদে উঠিয়া প্রথমেই বাবুর্চিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম এই পাগল আর কেহ নহে আমাদের নেজামউদ্দিন! বাবুর্চি তাহাকে দূর হইতে খুব শাসাইতেছে, কিন্তু ভয়ে তাহার নিকট যাইতে পারিতেছে না। কয়েক জন হোষ্টেলের ছাত্র ও বাহিরের কয়েকজন সেখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছেন। কেহ বাবুর্চিকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং উৎসাহ দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "যাওনা বাবুর্চি আগিয়ে, ভয় কিসের? ও পাগলটা তোমার কি করবে?" কেহ বা বলিতেছেন, "বাবুর্চি, তুমি কোন কাজের নও। আরে চট করে ওর লাঠিটা কেড়ে নিলেই ত মিটে যায়।..." ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত বাবুর্চি পাগলের নিকট যাইতে পারিল না। কেবল দূরে থাকিয়াই তাহার বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোকপ্রাপ্ত সুশিক্ষিত (?) হোষ্টেলের ছাত্রগণ তাহাতে এইরূপ বিকট অঙ্গ ভঙ্গি (এ উহার গায়ে ঠেলা মারিয়া) সহকারে আনন্দে হাসিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের কাহার কয়টা দাঁত, এবং মুখের গভীরতা কতটা, এসমস্ত বিষয় অবগত হওয়া কাহারও পক্ষে সে সময় তেমন কষ্টকর হইত না।

আমি একবার মনে করিলাম—'যাই, তাকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করি।' কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল—'বেশ,

তাকে ত উদ্ধার করতে যাব, কিন্তু এর মধ্যে যদি সে আমাকে চিনে ফেলে ! তা হলেই ত সে আমার মান মর্য্যাদা সব নষ্ট করে দিবে (?) ! ছেলেরা যখন দেখবে যে, তার মত একটা আস্ত পাগলের সঙ্গেও আমার আলাপ আছে এবং সে আমাকে বিলক্ষণ চিনে, তখন কি কেলেঙ্কারীটাই না হবে ? আর সে যে আমাকেও লাঠি নিয়ে তাড়া করবে না সে কথা কে বলতে পারে ?'—এই সকল বিষয় ভাবিয়া আর তাহাকে উদ্ধার করতে ইচ্ছা হইল না। স্নুতরাং নীরবে বসিয়া বসিয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম।

কথিত আছে—মুসলমানের (অবশ্য কলিযুগের বাঙ্গালী মুসলানের) তিনটা ছেলেকে একজায়গায় কবর দিলে তারা ভূত হয়ে সেই কবরের মধ্যেই উৎপাত আরম্ভ করে ;—কাজেই আমরা সেইরূপ ষাটৃ পঁয়ষট্টিজন ছেলে জীবন্ত অবস্থায় থাকিতে কি এই হোষ্টেলে পাগলের পাগলামী খাটে ? অতএব আমাদের নেজামউদ্দিন অবশেষে তাহার পোঁটলা পুঁটলী গুটাইয়া লইয়া আমাদের গুণগান (?) করিতে করিতে এবং জোর গলায়—আমরা যে তাহার বড় কুটুম্ব এবং এইরূপ আরও অনেক প্রকারের মধুর আত্মীয় হই, এই কথা সকলকে জানাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার খোঁড়াইয়া হাঁটা দেখিয়া সে যে শুধু পাগল নহে খোঁড়াও বটে, ইহা ভাবিয়া মনে বড় দুঃখ হইল। চলিবার সময় তাহার খোঁড়া পা টা পিছনে অর্থাৎ হোষ্টেলের

দিকে সমকোণ আকারে তুলিতেছিল। কিন্তু সেটা তাহার পায়ের অসুখের জন্য অথবা হোষ্টেলের ছাত্রদিগকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য, তাহা বলা শক্ত।

বাহিরে গিয়া পাগল কি করে ইহা জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইল। সেই জন্য ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। কিন্তু বাহিরে যাইবার জন্য যেমনই সিড়িতে পা দিয়াছি অমনি য়্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্বর কানে আসিল।

আমি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মৌলভী সাহেব, আমাকে ডাকছেন কি ?

"হাঁ, আপনার একখানা চিঠি আছে নিয়া যান।" আমি চিঠিখানা লইয়া বড় আগ্রহের সহিত পড়িতে লাগিলাম। (কারণ ছাত্রগণ, বিশেষ করিয়া বোর্ডিংএর ছাত্রগণ একখানি চিঠির জন্য বিশেষ লালায়িত।) কিন্তু আমার তুর্ভাগ্যবশতঃ কোন সুখবরের পরিবর্ত্তে সেখানে লেখা ছিল,—"আমার স্নেহাশীষ নিবে। অনেক দিন হতে তোমার পত্র না পেয়ে বড় চিন্তিত আছি। তোমার দাদাজান অত্যন্ত পীড়িত, বাঁচিবার আশা খুব কম। পত্র পাঠ মাত্র তুইদিনের ছুটি নিয়ে চলে আসবে। বাটীস্থ অন্যান্য সংবাদ ভাল। তোমার কুশল কামনা করি। ইতি—...আশীর্ব্বাদক তোমার পিতা।"

চিঠি পড়িয়া মন বড়ই খারাপ হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম, সেই পাগলটার অভিশাপের ফলেই আমার এই

শাস্তি হইল। যাহা হউক মনকে প্রবোধ দিয়া তখনই একটা দরখাস্ত লিখিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাসায় উপস্থিত হইলাম।

ছুটি মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইল না। হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি পরিষ্কার কাপড় পরিয়া রাস্তা খরচ সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। তারপর বাজারে কিছু ফলমূল কিনিয়া টম্‌টমে উঠিয়া শীঘ্রই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইতেই গাড়ী আসিল। আমিও দয়াময়ের নাম স্মরণ করিয়া ট্রেনে উঠিয়া পড়িলাম।...

দুই দিবস গত হইয়া গিয়াছে। সেই দিন বাড়ীতে পৌঁছিয়া যখন দাদাকে দেখিলাম তখন তিনি এই জগৎ হইতে ছুটি লইয়া অন্য জগতে চলিয়া গিয়াছেন। কেবল তাঁহার ক্ষণভঙ্গুর দেহটী কাফন (মৃতদেহকে যে পোষাক পরান হয়) পরিয়া বেশ আরামের সহিত শুইয়া আছে। অগত্যা হতাশ হইয়া সকলের সহিত কাঁদিতে সুরু করিলাম।—সে সব কথা বলিয়া আর কি হইবে ? এখন আমার ছুটি ফুরাইয়াছে তাই গরুর গাড়ীতে চড়িয়া রেল ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইলাম।...কয়েক ঘণ্টা পরে আমার গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিল। ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, রাজসাহী যাত্রী ট্রেন আসিতে তখন আরও সাড়ে তিন ঘণ্টা বাঁকী। অতএব কিছু জলযোগ করিয়া গাড়ীতে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম, এবং চাকরকে

বলিয়া দিলাম, যেন টিকিট কাটার ঘণ্টা পড়িলেই, সে আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শুইয়া কেবল দাদার কথাই মনে হইতে লাগিল এবং চোখে দুইটি মুক্তাফল দেখা দিল।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া উঠিয়া বসিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি নেজাম! সে আমাকে দেখিতে পাইয়াই বলিল, "কি বাবু, বাড়ী কবে আসা হয়েছিল?"

আমি—আজ দুই দিন হ'ল, তুমি ভাল আছত? নেজাম—হাঁ, আল্লা চাহে ত বেশ আছি।—আচ্ছা, তোমার চোখে পানি কেন?

আমি বড় অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলিলাম—ও—এমনি, বোধ হয় ঘুমের ঘোরে বেরিয়েছে।

নেজাম—উঁ—হুঁ—! ও এমনি কিছুতেই নয়। তুমি কাঁদছিলে কেন তা আমাকে বলতেই হবে। সে কথা না শুনে আমি আর এখান থেকে নড়্ছিনা।

তাহার কথা শুনিয়া আমার মন অনেকটা নরম হইয়া গেল। চোখ দিয়া আরও জল বাহির হইতে চাহিল। আমি অতি কষ্টে তাহা দমন করিলাম। ভাবিলাম,—হায়, যাদের এমন হৃদয়, যারা পরের সুখ দুঃখ বোঝে, তাদের লোকে পাগল বলে কেন? যাহা হউক তাহার পীড়াপীড়িতে অবশেষে বাধ্য হইয়া আমার দাদার মৃত্যুর কথা তাহাকে বলিলাম।

সে সমস্ত কথা শুনিয়া 'হাঃ, হাঃ' করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—ও,—দাদার মৃত্যুতে এ মায়াকান্না কাঁদছো ? কেন সে বুড়াটার জন্য কাঁদবে ? আচ্ছা বল দেখি, তুমি যখন মরবে তখন কি সেই বুড়াটা তোমার জন্য কাঁদতে আসবে ?

কি এখই ঐ বিরাট অগ্নিকুণ্ডে পাঠান হইবে ?—

আমি তাহার এইরূপ ব্যবহারে খুবই আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার জন্য যে সহানুভূতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হারাইয়া গেল। সে যে একটা বড় দরের পাগল সেই কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কড়া স্বরে বলিলাম,—দেখ নেজাম, হিসাব করে কথা বল, সব সময় তোমার পাগলামি ভাল লাগে না, বুঝেছ ?

এই কথা শুনিয়া সেও রাগিয়া উঠিয়া বলিল—দেখ, সব সময় পাগল পাগল করো না। আমি যে পাগল তা কি আমার গায়ে লেখা আছে ?

আমি—তা কি কারও গায়ে লেখা থাকে ? আচার, ব্যবহার, পোষাক, পরিচ্ছদ প্রভৃতি দেখেই লোক চেনা যায়।

নেজাম—বেশ, আমার ব্যবহারে এমন কি দেখলে যাতে লোকে বুঝতে পারে যে, আমি একটা আস্ত পাগল ?

আমি—তার কারণ তুমি, ছেঁড়া কাপড় পর, যা তা বাজে বকতে থাক, খামখেয়ালীর মত যা খুসী তাই কর, তোমার মতের সঙ্গে কারও মতের মিল হয় না...এ সমস্ত কারণেই প্রমাণ হয় যে, তুমি একটা আস্ত পাগল।

নেজাম—দেখ, জগতে অনেক বড়লোক ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড় পরেন এবং প্রত্যেকেই নিজের খেয়াল মত চলেন অথচ তাঁরা পাগল না ! আর যদি মতের মিল না হওয়াকেই পাগলামির চিহ্ন বলে মনে কর, তাহলে জিজ্ঞাসা করি—তোমার মতের সঙ্গে তুনিয়ার সব লোকের মত মিলেছে কি ? তুনিয়ায় তোমাদের মত ঠাণ্ডা মাথাওয়ালা যত লোক আছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের মত মিলেছে কি ?

আমি—না, তা কি মিলে ? সেটা অসম্ভব।

নেজাম—তাহলে তোমরা প্রত্যেকে অন্যকে পাগল বলনা কেন ? দেখ, আমি বলছি, তুনিয়াত আমাদের অর্থাৎ পাগল নাম ধারীর সংখ্যা তোমাদের চেয়ে খুবই কম বলে তোমরা আমাদের পাগল, ছাগল, ক্ষ্যাপা, প্রভৃতি যা খুসী তাই বলে যাচ্ছ। কিন্তু আমাদের সংখ্যা যদি তোমাদের চেয়ে বেশী হ'ত, তবে তোমরাই এ সব উপাধী পেতে, এবং এগুলো বাস্তবিকই তোমাদের ন্যায্য পাওনা, বুঝেছ ?

আমি তাহার এইরূপ কথায় অবাক হইয়া গেলাম। পাগলের পেটে যে এত কথা থাকিতে পারে ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। অতএব অনেকটা নরম গলায় জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কি রকম কথা, পাগল উপাধি আমাদের ন্যায্য পাওনা হলো কি ক'রে ?

নেজাম—তোমরা পাগল বই কি ? তোমরা এক জাতীয়

অনেকগুলী পাগল (যাদের মতের কতকটা মিল আছে এমন লোক) এক সঙ্গে মিলে পৃথিবীতে নানা দলের (যেমন—বাঙ্গালী, উড়িয়া, কাফ্রি, ইরানী, ইংরেজ, ইত্যাদি) সৃষ্টি করে বাস করছো, এবং মনে করছো যে, তোমরা খুব বুদ্ধিমান! তোমরা দুনিয়া নিয়ে মেতে আছ বলে আমাদের পাগল বলে থাক। কিন্তু দুনিয়া নিয়ে পাগল তোমরা, সে আমরা নই। অতএব তোমরাই যথার্থ—পাগল!

আমি—বেশ, তা না হয় হল। কিন্তু কেহ মরলে কি তার জন্য দুঃখ করা উচিৎ নয়? তুমি তখন হাস্‌লে কেন?

নেজাম—মৃত্যুতে দুঃখ করার মত এমন কি আছে? মৃত্যু হলেই ত আত্মা মুক্তি পেল। এটা একটা সুখবর বলতে হবে। এর জন্য আবার দুঃখ করব কেন? কাহারও মৃত্যুতে এইরূপ মনে করা উচিৎ যে, তিনি যে পথ দিয়ে গেলেন আমরাও একদিন সেই পথ দিয়ে যাব, এবং তাঁরই মত একদিন মুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলতে পারব।

আমি—তবে কি মৃতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা একেবারেই উচিৎ নয়?

নেজাম—হাঁ, দুঃখ করা যেতে পারে। তবে তিনি যে মরে গেলেন, আর ফিরে আসবেন না, আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না,… …এসব কারণে নয়। বরং দুঃখটা নিজেদের অর্থাৎ জগতের দিক দিয়ে প্রকাশ করাই ভাল। অর্থাৎ তিনি

যাওয়াতে যে জগতের ক্ষতি হ'ল, তিনি বেঁচে থাকলে জগতে আরও অনেক মঙ্গল জনক কাজ করতে পারতেন, এই সমস্ত ভেবে দুঃখ প্রকাশ করা যেতে পারে।

আমি—আমার কিন্তু মৃতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করাটা অন্যায় বলে মনে হয় না।

নেজাম—এটা তোমার ভুল ধারণা। মৃতের জন্য দুঃখ করা যে খুবই অন্যায় সে কথা আমার অল্প বুদ্ধিতে যথাসাধ্য বুঝাবার চেষ্টা করছি শোন।—জগতের সমস্ত কাজই দয়াময় প্রভুর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। মৃত্যুও তাই। এখন এই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা মানেই হচ্ছে তাঁর কাজে অসন্তুষ্ট হওয়া। অতএব এটা অন্যায়। তার পর সবাকেই যখন একদিন নিশ্চয় মরতে হবে তখন আর মৃতের জন্য শোক করা কেন? আর দেখ দুঃখ প্রকাশ করাটা নিজের অবস্থার কথা ভেবে হওয়াই সব চেয়ে ভাল বলে মনে করি।

আমি—সে কি রমক, ভাল করে বুঝিয়ে দাও।

নেজাম—নিজের দিকটা অর্থাৎ এই ভেবে দুঃখ করা উচিত যে, হায়! তিনি মুক্তি লাভ করলেন, আর এই পাপে ভরা পৃথিবী হ'তে ত আমাকেও একদিন যেতে হবে! তবে সে দিনটা আজকের এই দিনটাই হলো না কেন? আর কত দিন এ জগতে থাকব তা ত জানি না! এর মধ্যে না জানি কত পাপ কত অন্যায়ই না করব!……ইত্যাদি

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই কেমন যেন একটা গোলমাল শুনিতে পাইলাম। নেজাম যেন হঠাৎ কোথায় মিশিয়া গেল! আমার চাকরটার ডাকাডাকিতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বুঝিলাম এতক্ষণ কেবল স্বপ্নই দেখিয়াছি এবং ইতিমধ্যে ট্রেন আসিয়া ষ্টেশনে লাগিয়াছে। আমার চাকর টিকিট কাটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাকে নাই কেন, জিজ্ঞাসা করায় সে যাহা উত্তরে বলিল তাহাতে বুঝিলাম যে, প্রভুভক্ত চাকর প্রভুরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

যাহা হউক তাড়াতাড়ি টিকিট কিনিয়া ট্রেনে উঠিয়া পড়িলাম এবং অল্পক্ষণ পরেই ট্রেন চলিতে সুরু করিল।.........

হোষ্টেলে আসিয়া ঢুকিতে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে বাড়ীর খবর ভাল ত? বাড়ী ওয়ালী কেমন আছেন?"

আমি মনে মনে বিরক্ত হইয়া ছোট একটা উত্তর দিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। তার পর কাপড় চোপড় ছাড়িয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। দাদার কথার সঙ্গে সঙ্গে নেজামের কথাও মনে হইল। তাহার কথাগুলি (স্বপ্নের) ঠিক বিশ্বাস করিতে না পারিলেও একেবারে পাগলামি বলিয়া মনে হইল না। মনে মনে ঠিক করিলাম যে নেজামের দেখা পাইলেই তাহাকে কিছু দিয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া তাহার গ্রামে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। নেজামের সাক্ষাৎ লাভ আর ঘটিয়া উঠিল না।

ফুলার হোষ্টেল, রাজসাহী
ইং ১।৯।৩২

এঞ্জিন

মানুষের একটা জন্মগত অভ্যাস হইতেছে এই যে সে চিরকাল একই স্থানে স্থিরভাবে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, বা সকল সময় একই কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারে না ; একটু পরিবর্ত্তন চায়। সেই কারণেই স্কুলের-ছুটির পর ছাত্রেরা বা অফিস হইতে প্রত্যাগত কর্ম্মচারিগণ গৃহে স্থির থাকিতে পারেন না। বৈকালে একটু ভ্রমণ বা ক্রীড়া কৌতুক করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেহবা সেই সময়ের সুযোগ পাইলে থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখিয়া থাকেন।—আবার কোন এক প্রকার কার্য্য লইয়া সকল সময় অতিবাহিত করা যায় না। যেমন সন্দেশ খাইতে সকলের ভাল লাগিলেও রোজ যদি কেবল মণ্ডাই খাইতে হয় আর অন্য কোন জিনিষ না পাওয়া যায় তবে কিছু দিন পরে নিশ্চয় মণ্ডার নামে অরুচি জন্মিবে। অতএব পূজার ছুটি হওয়া মাত্র কোথাও বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। (কারণ ক্রমাগত তিনমাস কাল পাঠ্য-পুস্তক লইয়া ব্যস্ত থাকায় দেহ ও মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।) সঙ্গে সঙ্গে রংপুর সহরের রংটা কিরূপ তাহা দেখিবার ইচ্ছা বেশ প্রবল হইয়া উঠিল ; এবং ট্রেনের কল্যাণে রাজসাহী হইতে রংপুর যাইতে বার ঘণ্টার অধিক সময় লাগিল না।

আমার ধারণা ছিল রংপুর স্থানটী যখন তামাকের চাষের জন্যই বিখ্যাত তখন নিশ্চয় উহার রং তামাকের ধুমের চোটে হুক্কার মতই ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ হইবে, অথবা তামাক বিক্রয় করিয়া যে লাভ হয় সেই টাকার গরমে তাহার রং কতকটা কল্কের মতই রক্তবর্ণ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রংপুর সহরকে আমি হুক্কার নরিচার মধ্যে যে কাল দুর্গন্ধময় ময়লা থাকে সেইরূপই দেখিয়াছিলাম ; তাহার কারণ—আমার রংপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই যে ঝড় ও বৃষ্টি সুরু হইল তাহা তিন দিবা রাত্রির মধ্যে একবারও থামিল না। মনে হইল যেন রংপুরের ভাগ্যনিয়ন্তা আমাকে নাস্তা নাবুদ করিবার জন্যই মেঘ-রাজকে সাড়ে বিরানব্বই হাজার মণ খাম্বিরা তামাক উপহার দিয়াছেন। তামাক পাইয়া মেঘরাজের সে-কি স্ফুর্ত্তি ! তাঁহার দুইটা বিরাট গড়গড়া হুক্কায় পালা ক্রমে জল বদলাইয়া তামাক চড়ান হইতে লাগিল। এদিকে যে বৃষ্টির আধিক্য বশতঃ রাস্তা ঘাটে বন্যার সৃষ্টি হইল সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই ; তাহার উপর তাঁহার এক একটা 'টানের' ফলে কল্কের মাথায় আগুন জ্বলিতে লাগিল, এবং মেঘের ভিতর দিয়া তাহারই এক এক ঝলক আগুন ছিটকাইয়া বাহিরে আসিতে লাগিল। সেই আগুনের চ্ছটায় চোখে ধাঁধাঁ লাগে ! সেই হুকার কি কর্কশ রব !—ক্কড়াৎ—ক্কড়্-ক্কড়্-ক্কড়্-ক্কড়্-ডুড়ুম্—গুড়্-গুড়্-গুড়্-গুড়্-গুম্...... হুড়্-হুড়্

হুড়্-হুড়্—হুম হুম !! এদিকে আমাদেরও 'আক্কল গুড়ুম্' ! (কোথায় লাগে ইহার কাছে করিম চাচার ডাবা হুকার 'খুড়া খুড়া' ডাক !) সেই সঙ্গে দুইটা ভীষণাকার দৈত্য মিলিয়া তাঁহার কল্কের আগুনে খুব জোরে ফুঁ দিতে লাগিল, তাহার চোটে রংপুর সহরের উপর দিয়া অবিরাম গতি ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল, এবং আমরাও একরূপ ঘরে বন্দী হইলাম।—যাহা হউক এইরূপ বিপদের মধ্যে পড়িয়া রংপুরের আসল রংটী দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইল না।...............

তৃতীয় দিবস রাত্রি সাড়ে ৯॥ টার ট্রেন ধরিবার জন্য বহু কষ্টে কাদা জলের মধ্য দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। কারণ সেই দুর্য্যোগের মধ্যে আর এক ঘণ্টাও সেখানে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। ছাতা মাথায় দিয়া চলাতেও সমস্ত কাপড় জামা ভিজিয়া গিয়াছিল, জুতা ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না, কাজেই তখন তাহাদের স্ফূর্ত্তি দেখে কে ? একেবারে 'আনন্দে আটখানা' হইয়া হাতের উপর উঠিয়া বসিল ! আমি আর 'না' করিতে পারিলাম না। কারণ একেত প্রায় ছয় সাত মাস ধরিয়া তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকায় বেশ একটা মমতা জন্মিয়াছিল, তাহার উপর এতদিন যে তাহারা আমাকে বুকে করিয়া বেড়াইয়াছে সে কথাও আমি ভুলিতে পারি নাই।........
যাহাহউক ট্রেণ আসিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। কারণ সেই ট্রেণ পার্ব্বতীপুর জংসনে দার্জ্জিলিং মেল ধরাইবে

বলিয়া শুনিয়াছিলাম। আমি শীতে বেশ কাঁপিতে লাগিলাম ঠক্ ঠক্ করিয়া কি রি-রি-রি-রি করিয়া তাহা ঠিক মনে নাই, তবে মাঝে মাঝে আমার দাঁতে দাঁতে যে ঠোকাঠুকি হইতেছিল সে কথা বেশ মনে আছে। মনে হইল যেন ম্যালেরিয়ার বুড়ী আমাকে খাব খাব করিতেছে।...... ...

প্রায় দেড়-ঘণ্টা পরে পার্ব্বতীপুর জংসনের প্ল্যাটফর্ম্মে নামিলাম। আর অমনি সে কী ডাকা হাঁকা!—'চাই পুরী মিঠাই ;—গরম খাবার আছে আসুন বাবু ;—পান বিড়ি সিগারেট, সিগারেট বিড়ি পান ;—টাটকা গোস্ত পরেটা আছে নিয়ে যান ;—কেক্-বিস্কুট-পাউরুটী, কি চাই আপনার ? চা গরম, গরম চা' (আমার মনে হইল বলি—তোরাই খা)... ইত্যাদি। এই সমস্ত ফেরীওয়ালারা যেন মনে করে ট্রেণের যাত্রীরা চৌদ্দ পুরুষেও কোন কিছু খায়নি, কাজেই জংসনে ট্রেণ থামা মাত্র মরার উপর যেমন শকুনি পড়ে সেইরূপ তাহাদের দোকানের চারিদিকে যাত্রীর ভীড় জমিবে।—তবে তাহাদের অনুমান একেবারে মিথ্যা হইল না। কথিত আছে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নাকি অসভ্য (?) ও রাক্ষস ছিলেন, কাঁচা মাংস খাইতেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা এই সভ্য যুগে যে ক্রমশঃ শকুনি হইতে চলিয়াছি সে দিকে লক্ষ্যই নাই।—ঐ যে মাথায় বিকট ক্ষতযুক্ত কুকুরটা খোলা খাবারের বাক্সের এক হস্ত দূরে দাঁড়াইয়া কান ঝট্ পট্ করিল তাহাতে কি ঐ সন্দেশগুলির

উপর কিছুই পড়িল না? ঐ বিস্কুট ও কেক্‌গুলি কিসের চর্ব্বির তৈরী? পরেটাগুলি কেমন ঘিয়ে ভাজা আর ঐগুলি কিসের মাংস? ঐ যে গলায় র‍্যাপার জড়ান অতি ক্ষীণ, বক্র মেরুদণ্ড বিশিষ্ট কাশির রোগীটা চা পান করিতেছে, ওকি থাইসিস (যক্ষ্মা) এর রোগী নহে? ঐ পেয়ালাটা কি সেই একই পাত্রের জলে ডুবান হইবে?—সেদিন যে পান ওয়ালার অসাক্ষাতে দুইটা কুকুর কামড়া কামড়ি করিতে করিতে পান-বিড়ি বিক্রয়ের ঐ কাঠের বাক্সের উপরে পড়িল এবং দুর্ব্বল কুকুরটা ভয়ে অস্থির হইয়া যে প্রস্রাব করিল তাহার অধিকাংশই ঐ বাক্সের মধ্যে পড়িল, ইহা কি পান ওয়ালা কোন উপায়ে জানিয়া ঐ বাক্সটা সাবান দিয়া ধুইয়াছে? পানগুলি বানাইবার পূর্ব্বে কি ভাল করিয়া ধোয়া হয়? ঐ যে ভদ্রবেশী লোকগুলি নির্ব্বিকার চিত্তে আনন্দের সহিত পয়সা দিয়া পথের আবর্জ্জনা-গুলি গিলিতেছে এবং লোভী কুকুরদলের সহিত মাঝে মাঝে উৎকট ভঙ্গীতে বাক্‌যুদ্ধ করিতেছে, তাহা মরার উপর শকুনির পাল ও কুকুরের কলহের কথাটা স্মরণ করাইয়া দেয় না কি?—এই সমস্ত চিন্তা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

ভাবিলাম ঐ লোকগুলির প্রত্যেকেই (দুই একজন ব্যতীত) নিশ্চয় কিছু আহার করিয়া তবে ট্রেণে চড়িয়াছে, এবং রাত্রি ভোর হইতে না হইতেই কোন না কোন যায়গায় নামিয়া পড়িবে। সেখানে খাদ্য সামগ্রীর অভাব হইবে না অথবা

এক রাত্রি না খাইয়া কেহ অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে না। বাড়ীতেও কেহ রাত্রিতে ঘুম হইতে উঠিয়া মাঝে মাঝে কিছু আহার করে না।—তবে এই ধ্বংশকর অভ্যাস কেন ? আমার মনে হইল ঐ লোকগুলি যে শুধু পার্ব্বতীপুরেই নাস্তা খাইল, ইহার পরে আর কোথাও কিছু খাইবে না এমন নহে ; উহারা যেখানে খাবার জিনিষ দেখিয়াছে সেইখানেই খাইয়াছে এবং পথের মধ্যে যেখানে খাবার জিনিষ দেখিবে সেখানেই কিছু না কিছু খাইবে। ইহার মূলে আছে লোভ ও তাহাদের কুঅভ্যাস। হায়, অবাধ্য লোভ ! হায়, অসংযমী বাঙ্গালী !! আর হায়রে ইসলামের আদর্শ ভোলা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় পীড়িত পথহারা বাঙ্গালার মুসলমান !!!..................

এদিকে আমার শারিরীক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে লাগিল। আমার মনে হইল যেন পার্ব্বতীপুর জংসনটা কোন পর্ব্বতের চুড়ায় বরফের উপর উঠিয়াছে। তাহা না হইলে এত শীত কোথা হইতে আসিল ?—সেই সময় যদি কোন মন্ত্র বলে আমি রেল কোম্পানীর 'বড় সাহেব' বা মালিক হইতাম তবে সমস্ত ষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের জন্য বিশ্রামাগার প্রস্তুত করিয়া দিতাম !—পার্ব্বতীপুরেরই বা দোষ কি ? শীতের কারণ যথেষ্টই ছিল। আমরা এক পেয়ালা খুব গরম চা বা দুধ ফুঁ দিয়া দশ মিনিটেই ঠাণ্ডা করিয়া দেই, আর সেই যায়গায় এই ঠাণ্ডা দুনিয়ার উপর দিয়া বাহাত্তর ঘণ্টা ধরিয়া

ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া যাইতেছে এবং সেই যে ঠাণ্ডা বারিপাতের আরম্ভ হইয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। তাহার উপর টাটকা জ্বর এবং গরম শুষ্ক বস্ত্রের অভাব; এরূপ অবস্থায় শীত না লাগিবে কেন ? তবে আমার মনে হয় জ্বর ও শীত এক সঙ্গে থাকায় আমার পক্ষে শুভই হইয়াছিল। (করুণাময় যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন।) কারণ জ্বর আসিয়া শরীরটাকে গরম না করিলে আমি শীতে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া এবং শীত না থাকিলে হয়ত অতিরিক্ত জ্বরের উত্তাপে আমি সিদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইতাম ! যাহা হউক রাজসাহী পৌঁছান পর্য্যন্ত আমি দুনিয়ায় থাকিব কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। দশ মিনিট পরে ট্রেন আসার কথা। কিন্তু এই দশটা মিনিট যেন তখন দশ ঘণ্টার ন্যায় দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

এই জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অতএব সেই দশ মিনিটেরও মিয়াদ ফুরাইল। দেখিতে দেখিতে খটাং ঝনাৎ খটাং ঝনাৎ, হুড়্-হুড়্-হুড়্-ইশ-শ্-শ্-শ্-শ্-শ্ করিতে করিতে মেল ট্রেন আসিয়া আমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একচোট ফেরীওয়ালাদের চীৎকার।—তাহারা বোধ হয় নূতন ভাবে গলাবাজী করিবার জন্যই ট্রেনটা আসিবার দুই মিনিট পূর্ব্ব হইতে নীরবে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।

মেল ট্রেনে মাত্র একটা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী থাকে, এবং সময়ে

সে গাড়ীতে যেরূপ ভীড় হয় তাহা দেখিবার জিনিষ, এমন কি সেই ভীড়ের ছবি তুলিয়া বায়োস্কোপে দেখাইলে নিঃসন্দেহে বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে। —এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে চলিবে কেন? বড় ও ছোটর মধ্যে অর্থাৎ সাহেব (ও বড় লোক) এবং সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে প্রভেদ কতখানি তাহা দেখাইতে হইবে তো? তাই যে সময় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ নরম গদীতে জমিদার বাড়ীর বড় কর্ত্তার ন্যায় আরামে ঘুমাইতে ঘুমাইতে চলিয়াছেন, ঠিক সেই সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা জমিদার বাড়ীর সিদ্ধিখোর ভোজপুরী দারোয়ানদিগের মত হুড়া হুড়ি, ঠেলা ঠেলি, ও গোলমাল করিতে করিতে সমস্ত রাস্তা চলিয়াছে! নির্জ্জীব বাঙ্গালীর জন্য রেল কোম্পানীর আর চিন্তার অন্ত নাই! যাহাতে বাঙ্গালার জন সাধারণ উৎসাহ পাইয়া ব্যায়াম করিতে সুরু করে, এবং ক্রমশঃ তাহারা একটা পাহালওয়ান জাতিতে পরিণত হয় সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এবং খুব 'মাথা খাটাইয়া' প্রত্যেক মেল ট্রেনের সহিত কুস্তির আখড়ারূপ একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী জুড়িয়া দিয়াছেন! কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, অবুঝ বাঙ্গালী এইজন্য কোম্পানীর উদ্দেশ্যে গালাগালি করে!!

এই ট্রেন জংসনে পাঁচ ছয় মিনিট অপেক্ষা করে বলিয়া 'ধীরে সুস্থেই' গাড়ীতে উঠিলাম। তাহা না হইলে বোধ হয় আমি উঠিবার পূর্ব্বেই গাড়ী ছাড়িয়া দিত! গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ

করিয়া দেখিলাম এতটুকুও স্থান নাই, এবং দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। একজন পরিষ্কার পোষাক পরা ভুঁড়িওয়ালা মাড়োয়ারী নির্ব্বিকার চিত্তে বিলাতী কম্বল গায়ে জড়াইয়া সাদা নরম বিছানার উপর শুইয়া আছে। তাহাকে কিছুতেই উঠান গেল না। কারণ বাঙ্গালীর গায়ের জোর এবং টাকার জোর দুই-এরই অভাব, এবং শুধু মুখের জোর যতই হউক সকল সময় তাহা কাজে লাগে না। যাহা হউক আমার একজন রংপুরের সঙ্গী আমার অসুখের কথা জানিতেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জায়গাটী আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমি প্রথমে বসিতে আপত্তি করায় তিনি আমাকে একরূপ জোর করিয়া ধরিয়া বসাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন,—আমিতো একটু পরেই হিলিতে নেমে যাব, ততক্ষণ আপনি অসুস্থ শরীরে দাঁড়িয়ে কষ্ট ভোগ করবেন কেন?—অগত্যা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বসিয়া পড়িলাম।........

যখন ঈশ্বরডিহি জংসনে পৌছিলাম তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটা। এখান হইতে রাজসাহীর ট্রেন প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ছাড়ে। এই দীর্ঘ তিন ঘণ্টা কাল কিরূপে কাটিবে ভাবিয়া অস্থির হইলাম। জ্বর এত বেশী হইয়াছিল যে মাথা তুলিতে পারিতেছিলাম না, এবং হাঁটিতে গিয়া টল মল করিতেছিলাম। দেখিলাম ব্যায়ামপুষ্ট শরীর হওয়া সত্বেও আমার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি নাই। সুখের বিষয়

রাজসাহীর গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্মের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল (কেবল এঞ্জিন ছিল না)। আমি অতি কষ্টে সেই ট্রেনের এক কামরায় যাইয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম, এবং একটু পরেই একেবারে অজ্ঞান হইলাম।......

* * * এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়াছিল জানি না। আমার মনে হইল গাড়ীর মধ্যে খুব গরম বাতাস-শোঁ-শোঁ-করিয়া বহিতেছে, এবং তাহাতে আমি বেশ কষ্ট অনুভব করিতেছি। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য উঠিয়া বসিলাম, এবং চোখ রগড়াইয়া তাকাইতেই যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার বুদ্ধি হারাইয়া গেল! আমি এ কোথায় আসিয়াছি? আমি কি মরিয়া গিয়াছি? যদি মরিলাম তবে মৃত্যু যন্ত্রনার কথা স্মরণ হয় না কেন? আমি কি কোন গুরুতর পাপ কার্য্য করিয়াছি? তাহা না হইলে এই প্রেতপুরীতে আসিলাম কেন? আমাকে কি এখনই ঐ বিরাট অগ্নি কুণ্ডে পাঠান হইবে?—

দেখিলাম আমি এক প্রকাণ্ড হল ঘরে লৌহ নির্ম্মিত চেয়ারে বসিয়া আছি। সেই ঘরটা গোলাকৃতি, আগা গোড়া লোহার পাতে মোড়া, এবং ঘোর অন্ধকার, ইহার পরিধি প্রায় দুই মাইল হইবে, এবং উচ্চতা প্রায় এক হাজার ফুট! রেল সড়কের পুলের নীচে যে লম্বা চওড়া লোহার তীর গুলি থাকে তাহার প্রায় পঁচিশ গুণ লম্বা, চওড়া ও মোটা এক একটা লোহার তীর ও কড়ি বর্গা এই ঘরে লাগান হইয়াছে। তাহার কোন

কোনটায় এক একটা বিরাট লোহার চামচ ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহার ফানেল মোটা মোটা লোহার শিকল দিয়া ঝুলান আছে। ঘরের এক কোণে একটা ছোট খাটো পাথুরিয়া কয়লার পাহাড় এবং তাহার নিকটেই একটা প্রকাণ্ড কাল কুচ্‌কুচে জলের ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চা রহিয়াছে। সেটা একটা দীঘির সমান এবং যে নল দিয়া তাহার জল বাহির হয় তাহার ব্যাস পাঁচ ফুটের উপর! সেই ঘরের মাঝখানে একটা নীচু যায়গায় স্তূপাকৃতি কতকগুলি অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার ফলে সেই ভূতের মত চেহারা বিশিষ্ট ঘরটার কোন কোন অংশ অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এবং সেই আগুনের জন্যই ঘরটা বেশ গরম হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ধূমের অভাব নাই।

আমার সম্মুখে যে ভীষণকায় দৈত্যটা দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার কথা মনে হইলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তিনি প্রায় এক শত হাত উঁচু, রংটা ঠিক কয়লার মত! তাঁহার পরনে ঘোর কাল 'সুট' (কোট ও প্যাণ্ট,) এবং ধানের গোলার চেয়ে বড় ভুঁড়িটা প্রায় সাত হাত চওড়া একটা লাল রংএর বেল্ট দিয়া বাঁধা। সেই বেল্টের উপর চাপরাশের মত পিতলের একটা চকচকে জিনিষ; মনে হইল তাহার কতকগুলি ছিদ্র আছে এবং সেইগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার পেটের ভিতর জ্বলন্ত আগুনের মত কি যেন দেখা যাইতেছে। তাঁহার মাথায় একটা

কাল রংএর হ্যাট (বোধ হয় লোহার তৈরী)—তাহার সম্মুখ দিকে আমাদের সম্রাটের মুকুটের ছবি! (ভাবিলাম ইংরাজেরা যমালয়ে ও রাজত্ব করে নাকি?—তিনি হাঁ করিয়া কতকগুলি পাথুরিয়া কয়লা সেই প্রকাণ্ড চামচ দিয়া তুলিয়া মুখে দিয়া তাঁহার বড় বড় পাটার মত দাঁত দিয়া চিবাইয়া খাইতেছেন, এবং সেই প্রকাণ্ড ফানেল-মুখে দিয়া কল টিপিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পাঁচ শত মণ জল তাঁহার পেটে চলিয়া যাইতেছে। তাঁহার নাকের এক ছিদ্র দিয়া অনবরত গরম বাষ্প আর অন্যটা দিয়া আগুনের টুকরা ও ধুম বাহির হইতেছে! তাঁহার কপালে একটী মাত্র প্রকাণ্ড গোলাকার চক্ষু বিদ্যুতের মত জ্বলিতেছে! সেদিকে চাহিতে চোখ ঝলসিয়া যায়! তিনি ঐরূপে আহার ও জলপান করিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া ঘরের চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া পুনরায় কিছুক্ষণ একস্থানে দাঁড়াইয়া আরাম করিতেছেন! উঃ, সে কি তাণ্ডব নৃত্য! সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার চোটে টলমল করিতেছে এবং তাহার শব্দের চোটে হৃতকম্প উপস্থিত হইতেছে! তাঁহার পায়ে ইস্পাতের তৈরী বুট জুতা থাকায় সেই শব্দ এমন কর্কশ হইয়াছে যে কর্ণ বধির হয় আর কি? ....

কিন্তু একি? এতবড় একটা দৈত্যের গলার স্বর এত মিহি? তিনি কি আমাকে ডাকিতেছেন?—হাঁ, অনুমান মিথ্যা নয়। ভাবিলাম এইবার বোধ হয় আমাকে আহার

করিবার অথবা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার পালা !—হায় ! মৃত্যুর পরে যে এই বিপদের মধ্যে পড়িতে হইবে ইহা পূর্ব্বে জানিলে কখনই কোন অন্যায় কাজ করিতাম না। আহা পুনরায় যদি দুনিয়ায় ফিরিয়া যাইতে পারিতাম !·········এখন আর সে কথা ভাবিয়া কি হইবে ?·········আমি ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। কাঁপিতে কাঁপিতে কোন রকমে হাত জোড় করিয়া বলিলাম,—"খোদার দোহাই, আপনি আমাকে শাস্তি দিবার পূর্ব্বে আমি কোন পুণ্য কাজ করেছি কিনা সে কথা শুনুন !" তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ভয় করোনা, আমি যমরাজ আজরাইলও নই অথবা তোমাকে শাস্তি দিতেও নিয়ে আসিনি।—ছিঃ, অমন জ্বর নিয়ে শুধু বেঞ্চের উপর কেউ শুয়ে থাকে ? আমি তোমার ওরকম অবস্থা দেখে এখানে নিয়ে এসেছি। এই ঘরের গরমে তুমি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছ এবং একটু পরেই তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে, কারণ এই গরমে বেশীক্ষণ থাকাও তোমার পক্ষে উচিত হবে না। কিন্তু তুমি যাওয়ার পূর্ব্বে তোমাকে কয়েকটা কথা বলবো ব'লে মনে করেছি, এবং সেই জন্যই ডাকছি।"

আমি তাঁহার এইরূপ মোলায়েম কথা শুনিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম এবং শাস্তি পাইতে হইবে না দেখিয়া এবং আমি জীবিত আছি ভাবিয়া দয়াময়ের উদ্দেশে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু তখনও সন্দেহ একেবারে যায় নাই।

কারণ এরূপ অদ্ভুত স্থানে ঐ জাতিয় জীবের কথা তো কখনও শুনি নাই। তবে কি আমাকে পাতাল পুরীতে ভূতের বাড়ীতে আনা হইয়াছে ? এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় হইল। যদি তিনি হঠাৎ চটিয়া যান ? তবে কোন রকমে ভয়ে ভয়ে উত্তর করিলাম—"আপনি আমাকে কিছু বলবেন এটা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আপনার পরিচয় সম্বন্ধে কিছু না জানলে তো আমার সন্দেহ যাবে না, এবং সেই অবস্থায় আপনার মূল্যবান কথাগুলির দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

তিনি—আমার সম্বন্ধে এটুকু মাত্র জেনে রাখ যে আমি একটা এঞ্জিন, এবং এই যায়গাটার নাম এঞ্জিন পাড়া। এখানে আমার মত ছোট বড় অনেক রেল এঞ্জিন ও অন্যান্য এঞ্জিন বাস করে।

আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন করা অনুচিত হইবে ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলাম—এবার আপনি দয়া করে আপনার কথা সুরু করুন।

তিনি—দেখ, তুমি এ কথা নিশ্চই জেনো যে জগতে উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে কোন জিনিষই সৃষ্টি করা হয় নাই। তুমি প্রত্যেক জিনিষের কাছে কিছু না কিছূ উপদেশ নিতে পার, এবং এজন্য তোমার দৃষ্টি শক্তিকে তীক্ষ্ণ ও তোমার মনকে সকল সময় সজাগ রাখতে হবে। এ বিষয়ে যদি অবহেলা বা অবজ্ঞা কর তাহলে তুমি হয়তো এত মূল্যবান জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হবে, যা সারা জীবন চেষ্টা করলেও আর লাভ করতে পারবে না।

আমি—দেখুন এ জগতে এত বেশী ভিন্ন রকমের জিনিষ আছে যে একটা মানুষের পক্ষে সে সমস্ত থেকে উপদেশ নেওয়া অসম্ভব। এখন আমি কোন্ কোন্ বিষয় হতে উপদেশ নিতে পারি তা দয়া করে বলে দিলে আমি সে বিষয় চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তিনি—হাঁ তোমার কথাটা মিথ্যা নয়। তবু দেখ, তুমি যতই চেষ্টা করনা কেন জগতে কখন একা থাকতে পার না। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্চয় এই জড় জগতের কোন না কোন জিনিষের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতা থাকে। ঠিক সেই সময় যদি তুমি সেই জিনিষ সম্বন্ধে খুব স্থির ভাবে চিন্তা কর তবে কিছু জ্ঞান লাভ না করেই পার না। অবশ্য এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাদের নিকট হতে কেবল সূক্ষ্মদর্শী লোকেরাই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। তবে সচরাচর তুমি এমন অনেক জিনিষই দেখে থাক যেগুলির কাছ থেকে সাধারণ লোকেও অনায়াসে কিছু শিখিতে পারে। এই ট্রেনের কথাই ধরা যাক। এটা এমন জিনিষ যা হতে তুমি চেষ্টা করলে অনেক জ্ঞান পেতে পার।

আমি—কৈ, ট্রেনের কাছে যে কিছু শিখিবার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আপনি যদি দয়া করে নমুনা স্বরূপ দুই একটা বিষয়ের উল্লেখ করেন তবে হয়তো আমি এ বিষয়ে চিন্তা করার একটা পথ পেতে পারি।

তিনি—বেশ, উদাহরণ স্বরূপ দুইটা বিষয়ের উল্লেখ করছি: দেখ, প্রথমতঃ এই পৃথিবীকে তুমি স্বচ্ছন্দে ট্রেনের সঙ্গে তুলনা করতে পার।—এই পৃথিবী তার লক্ষ্যের পথে অবিরাম গতি ছুটে চলেছে যেমন তোমার দার্জ্জিলিং মেল কলিকাতার উদ্দেশে ছুটেছে। এক একটা নূতন শতাব্দীর আরম্ভ হচ্ছে পৃথিবীর চলতি পথের এক একটা ষ্টেশন। তুমি যেমন হঠাৎ এক ষ্টেশনে ট্রেনের মধ্যে উঠলে, গাড়ীর অপরিচিত যাত্রীদের সঙ্গে চট করেই ভাব হয়ে গেল; সেখানে গল্প, গুজব আমোদ, আহ্লাদ, সুখ দুঃখ ভোগ ইত্যাদি সবই কিছু হলো, তারপর ট্রেনের চলতি পথের শেষ হবার বহু পূর্ব্বেই তোমার নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে গাড়ী থামলে তুমি সবারই কাছে বিদায় নিয়ে নেমে পড়লে; সংসারটাও ঠিক সেই রকম নয় কি ?

আমি—জী হাঁ, কতকটা সেই রকমই বটে।

তিনি—তারপর দেখ, সেই চলতি পথে ট্রেন যদি তার নির্দ্দিষ্ট লাইন ভুলে হঠাৎ অন্য লাইনে চলে যায় তাহলে যেমন সে অন্য দিকে চলে যেতে পারে অথবা তার সঙ্গে অন্য ট্রেনের ঠোকা-ঠুকি হতে পারে, সেই রকম পৃথিবী যদি কোন রকমে একবার নিজের কক্ষ ভ্রষ্ট হয়, তবে সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড গ্রহের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হওয়টা অসম্ভব নয় এবং তা'হলে পৃথিবী এমনি ভাবে গুঁড়া হয়ে যাবে যে তখন তার কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকবে না।—আবার দেখ, সংসারে সাধারণতঃ তিন রকমের

লোক বাস করে। প্রথম রকমের লোকগুলো নিজেদের ন্যায্য পাওনা পেলেই সুখী হয়; তারা কাহারও সাহায্য করতে বা কাহারও অসুবিধার সৃষ্টি করতে চায় না, ট্রেনের সাধারণ যাত্রীরা সেই রকম। এরা নিজেদের ন্যায্য পাওনা না পেলে বিরক্ত হয় বটে কিন্তু তার জন্যে মারামারি করতে যায় না। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হয় মানুষরূপী শয়তান। এদের অন্তরটা লোভ, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতিতে ভরা। এরা নিজেদের প্রাপ্যের অনেক বেশী ভোগ দখল করতে চায় এবং পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে সম্পূর্ণটাই নিজে খেতে চায়। তোমার পার্ব্বতীপুরের সেই মাড়োয়ারীটা এই দলের। এদের দেখলে 'ঈশপ্‌স্ ফেবলস্'এর 'দি ডগ ইন দি ম্যানজার'এর সেই বদমেজাজী কুকুরটার কথাই মনে পড়ে। (সকল মাড়োয়ারীই যে এই রকম সে কথা আমি বলছি না।) তারপর তৃতীয় প্রকার লোক—এঁদের মধ্যে ফেরেস্তাদের গুণ কিছু পরিমাণে থাকে। এঁরা অনেক সময় পরের জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে থাকেন। তোমার রংপুরের সঙ্গীটী, যিনি তোমার দুঃখ দেখে নিজের জায়গায় তোমাকে বসিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তিনি এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়।

আমি—দেখুন, হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়েছে। একদিন আমাদের একজন প্রফেসার (অধ্যাপক) বলছিলেন—"তোমরা ট্রেনে চড়ে যদি নিজের জন্য বসবার জায়গা দেখতে না পাও,

তবে জোর করে সাধ্যমত ঠেলাঠেলী করে সেখানে নিজের জায়গা করে নিবে। নিজের অধিকার ছাড়বে কেন ? দুনিয়ার নিয়মই হলো—জোর যার মুলুক তার—বুঝলে ?" এবিষয়ে আপনার মত কি ?

তিনি—এ বিষয়ে আমার মতের একটু পার্থক্য আছে। দেখ, সাধ্যমত অন্যের কষ্টের বা অসুবিধার সৃষ্টি করা ঠিক নয়; কারণ শুধু গায়ের জোরের সদ্ব্যবহার করাই যদি মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ থাকলো কোথায় ? তুমি কি মনে কর যে তোমার চেয়ে পশুদের দৈহিক আত্মসুখবোধ কম আছে ? তা নয় বরং এ বিষয়ে তারা তোমার চেয়ে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ। তবে মানুষে আর পশুতে প্রভেদ হচ্ছে এইখানে যে, মানুষ ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, পরের জন্য জীবন দিতে পারে, কিন্তু পশুরা তা পারে না। সেইজন্য আমি বলি যে, তোমার অস্তিত্বকে বজায় রেখে তুমি যথাসাধ্য অন্যের সুবিধা করে দিতে পার এবং তাহলে ঠেলাঠেলি বা মারামারি করার মত ব্যাপার প্রায়ই ঘটে না।

আমি—'নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে' একথার অর্থ কি ?

তিনি—এতো খুব সোজা কথা। মনে কর তুমি—পার্ব্বতীপুরের ট্রেনে উঠলে। তোমার উদ্দেশ্য রাজসাহী যাওয়া; যে কোন রকমেই হোক তোমাকে সেখানে যেতেই হবে; এখন গাড়ীর মধ্যে জায়গার অভাব দেখে তুমি মারামারি না করে

দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঈশ্বরডিহী পর্য্যন্ত আসতে পার, অথবা একটা রোগীর জন্য তোমার স্থানটা ছেড়ে দিয়ে তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে পার। তবু তুমি তোমার গন্তব্য পথে চলতে থাকবে। কিন্তু যদি তুমি নিজের অসুবিধা দেখে এবং গাড়ীর মধ্যে ভীড় দেখে নেমে পড় তবে তুমি পথ চলা থেকে ক্ষান্ত হলে এবং যথাসময়ে রাজসাহীতে পৌঁছিতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে। এরই নাম নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা।—আবার দেখ তুমি নিজ পরিবারকে ঠিক রেখে দান ধ্যান সবই করতে পার। কিন্তু তুমি তোমার বাড়ীটা বা তোমার স্ত্রী পুত্রাদি কোন ভিক্ষুককে দান করতে পার না, কিম্বা অন্যের সুবিধার জন্য বা পরিশ্রম ও কষ্টের হাত এড়াবার জন্য তুমি যে সদুপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন কর তা থেকে ক্ষান্ত থাকতে পার না। তুমি নিজের অস্তিত্ব ঠিক রেখে অনেকের উপকারের বা সেবার উপায় করতে পার। কিন্তু যদি তুমি নিজেই ভিক্ষুক বা পরের গলগ্রহ হও তবে তোমার দ্বারা অন্যের কি উপকার হতে পারে? তবে একটা কথা মনে রাখবে যেন তোমার জীবিকার পথ অন্যের অনিষ্টকর না হয়।

আমি—দেখুন সংসারে অনেকগুলো ধর্ম্ম আছে। এদিক দিয়ে সংসারের সঙ্গে ট্রেনের কোন সাদৃশ্য আছে বলে তো মনে হয় না।

তিনি—কেন হবে না? দেখ, প্রায় সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই

এক, মানুষের আত্মাকে সাংসারিক কালিমা থেকে মুক্ত করা। তেমনি এই ঈশ্বরডিহী দিয়ে যতগুলি ট্রেন যাচ্ছে তাদের প্রায় প্রত্যেকের লক্ষ্য কলিকাতা যাওয়া। আবার ধর্ম্মগুলি যেমন সমান শক্তিশালী বা কার্য্যক্ষম নহে, তেমনি ট্রেনগুলিরও গতি সমান নয়। দার্জ্জিলিং মেলে গেলে যেমন তুমি সবারই আগে ও মালগাড়ীতে গেলে সবারই পরে কলিকাতা পৌঁছাবে, তেমনি কোন ধর্ম্ম তোমাকে দ্রুত গতি এবং কোনটি অতি বিলম্বে তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাবে।—উদাহরণ স্বরূপ দুইটী নিয়মের উল্লেখ করছি ঃ—

প্রথমতঃ তুমি একটী বালককে বললে—"দেখ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ সকল জিনিষ সৃষ্টি করেছেন, তিনি ঐ সূর্য্যকে কেমন উজ্জ্বল করেছেন এবং তার গরম আলো তোমার গায়ে পড়াতে তোমার শীত পালিয়ে যাচ্ছে, কাজেই তুমি সেই দয়াময়ের উদ্দেশে সেজদা (প্রণাম) কর ; এবং আর একটী বালককে বললে—"তোমাকে শীত লাগছে ? আচ্ছা যাও রোদে বস ; কেমন গরম লাগছে, না ? শীত একটু কম লাগছে নয় ? দেখ, এই রোদ যা তোমাকে আরাম দিচ্ছে সেটা কোথা থেকে আসছে জান ? ঐ সূর্য্য থেকে এই রোদ আসছে। সূর্য্যটা কেমন উজ্জ্বল দেখেছ ? ঐ সূর্য্য, এবং এই সমস্ত গাছপালা, নদী, পাহাড়, আকাশ, পৃথিবী, জীব, জন্তু, যা কিছু দেখতে পাচ্ছ সে সমস্তই একজনে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, বুঝেছ ? এখন তোমার সেই আল্লার উদ্দেশে সেজদা করা উচিত, কাজেই সেজদা কর।'—

এখন এই দুইটী ছেলেই আল্লার পরিচয় পেল। কিন্তু প্রথম নিয়মটী যে দ্বিতীয়টী অপেক্ষা সরল ও সংক্ষিপ্ত তা স্বীকার করতেই হবে। উপরন্তু দ্বিতীয় নিয়মটীতে একটী গুরুতর বিপদের আশঙ্কা আছে। ছেলেটী সূর্য্যের চিন্তায় বা জীবজন্তুর চিন্তায় হঠাৎ এরূপ তন্ময় হয়ে যেতে পারে যে, তোমার পরের কথাগুলি তার কানে না যেতেও পারে। সে ক্ষেত্রে তোমার তাহাকে আল্লার পরিচয় দানরূপ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।—ঠিক সেই রকম তুমি যে মালগাড়ীতে চড়ে যাবে, কুলীদের ভুলে সেটা কলিকাতা না গিয়ে আমনুরা জংসনে যাওয়াটা বিচিত্র নয়। অতএব সকল সময় বিশেষ বিবেচনা করে নিজের যাত্রাপথের বাহনটা বেছে নেওয়া উচিত।

আমি—আপনি বলছেন যে, সমস্ত ধর্ম্মই একই উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হচ্ছে। তাহলে বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে এত মারামারি কেন ?

তিনি—দেখ, মানুষ যে ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক, প্রথমে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। পরে বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাপ, মা, আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি তাদের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতিতে পরিণত করে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তারা নিজ নিজ ধর্ম্মের সার মর্ম্মটা কি তা বুঝতে

কোন দিনই চেষ্টা করে না। তারা মনে করে যে, হিন্দুর ঘরে জন্মিলেই সে খাঁটী হিন্দু অথবা মুসলমানের মধ্যে জন্মেছে বলেই সে খাঁটী মুসলমান হল! তার উপর প্রত্যেক ধর্ম্মের লোকেই নিজেদের ধর্ম্মের বিধানের সঙ্গে কতকগুলো স্বার্থসিদ্ধির পথে সাহায্যকারী নিয়ম কানুন আচার ব্যবহার জুড়ে দিয়েছে। তার ফলে প্রত্যেকেই বহুদিন পূর্ব্বে নিজের ধর্ম্মের পথটা ভুলে নিজেদের সৃষ্টি সেই সমস্ত আবর্জ্জনার দ্বারাই চালিত হচ্ছে এবং যত রকম সাম্প্রদায়িক বিবাদের সৃষ্টি করে দুনিয়াকে অশান্তিময় করে তুলেছে।......

আজ প্রায় লোকেই খাসীর মাথার মাংস খেয়ে সন্তুষ্ট; কিন্তু হাড়ের খোলের মধ্যে যে মস্তিষ্ক আছে সেটা অনেকেই জানে না, অথবা খোলটা ভাঙ্গার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। আজকাল সকল ধর্ম্মের লোকই এমন একদল লোকের মত, যারা একটা রাস্তার দুই পার্শ্বের সামনা সামনি দুইটা বাড়ীতে বাস করে এবং প্রত্যেকে নিজের মোটর গাড়ীটা বারান্দায় তুলে নিয়ে এঞ্জিনের ঢাকনাগুলিশুদ্ধ সমস্ত গাড়ীটা জল দিয়ে হরদম ধুচ্ছে এবং সেগুলিতে নানা রংএর বার্নিশ ঘষ্‌ছে আর জোর গলায় অন্যের বার্নিশের নিন্দা করছে; এদিকে যে জলের ছিটা পেয়ে, রাস্তার ধূলা পড়ে এবং নিষ্কর্ম্মভাবে পড়ে থাকায় প্রত্যেক এঞ্জিনেই মরিচা ধরে নষ্ট হচ্ছে সে দিকে তাদের খেয়াল নাই।—......

আবার মনে কর তোমরা দুই দল লোক কলিকাতা যাবে বলে পার্ব্বতীপুরে উঠলে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। কিন্তু দুই দলই ভুল করে পাশাপাশি এমন দুটা মাল গাড়ীতে উঠলে যেগুলির মাঝখানে দুইটা জানালা থাকায় বেশ দু'দলের সঙ্গে দেখা শুনা চলতে লাগলো। আবার ব্যাপারটা এমনই হলো যে, উভয় দলই নিজেদেরটিকে যাত্রীবাহী ও অন্যদের গাড়ীকে মালগাড়ী বলতে লাগলো, নিজেরা ঠিক কলিকাতা যাবে এবং অন্যেরা কখনই সেখানে যেতে পারবে না এই বলে পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো, এবং শেষে গালাগালি ও জুতা ছোড়াছুড়ি সুরু হল। কিছুক্ষণ পর তোমরা তোমাদের গাড়ী আর চলছেনা দেখে শান্ত হলে, এবং ব্যাপার কি দেখবার জন্য বাহিরে গিয়ে দেখলে যে হিলী ষ্টেশনে তোমাদের রেখে দিয়ে ট্রেন বহুদূরে চলে এসেছে।···ঠিক সেই রকম আজ ধর্ম্ম প্রায় প্রত্যেক সমাজের কাছ থেকে বহুদূরে সরে পড়েছে।

আমি—তা হলে বর্ত্তমানে বিভিন্ন সমাজের লোকগুলো কোন অবস্থায় আছে ?

তিনি।—মনে কর তোমরা দুই দলই হিলীতে আছ এবং কলিকাতায় যেতে না পারায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন এই ক্ষতির জন্য তোমরা কখনই আপনাদের ভুল স্বীকার করবে না ; এর জন্য অন্য দলকেই সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করবে। এর ফলে তোমাদের মধ্যে একটা স্থায়ী বিদ্বেষভাবের সৃষ্টি ও

তার ক্রমবৃদ্ধি হবে। কিছুক্ষণ পরে তোমরা যে কলিকাতার যাত্রী এবং সেখানে যেতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ, সে কথা ভুলে গিয়ে অন্যের মনে কষ্ট দিবার জন্য নানা রকম ফন্দি আঁটতে লাগবে ; এবং অবশেষে মারামারি করে, ফৌজদারী সাক্ষী যোগাড়, দল পাকান প্রভৃতি কাজে এমনি মেতে যাবে যে, তখন আর কলিকাতার কথা মনেও হবে না।—বর্ত্তমান সমাজের লোকগুলির অবস্থাও ঠিক সেই রকম। তারা আজ তাদের লক্ষ্য, ধর্ম্ম, আদর্শ, এ সমস্ত কতকটা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়ে এবং কতকটা বিস্মৃত হয়ে একেবারে শয়তানের পাণ্ডা সেজেছে। সে সমস্ত দেখে আমাদের এই পাষাণ প্রাণেও একটু দুঃখ হয়।

আমি—আমরা যে ট্রেনে টিকিট কিনে চড়ি, এর মধ্যে কোন শিক্ষার বিষয় আছে কি ?

তিনি—হাঁ, খুব ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। এই টিকিট কাটার সঙ্গে পরকালের হিসাব নিকাশের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তুমি টিকিট দেখাতে না পারলে যেমন 'চেকার' তোমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিবে, তেমনি সৎকাজ তোমার পরকালের টিকিট। যদি তুমি টিকিট দেখাতে পার এবং সঙ্গে অতিরিক্ত মালপত্রও না থাকে, তবে শিয়ালদহের মত কড়া ষ্টেশনেও যেমন তোমার 'গেট' পার হতে কোন কষ্ট হয় না ; তেমনি তোমার মৃত্যুর পর তোমার আত্মা তোমার

মধ্যে খাঁটি ধৰ্ম্ম বিশ্বাস এবং অন্তরের পবিত্রতার জন্য উজ্জ্বল রূপবিশিষ্ট দেখাবে, তা দেখে ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতগণ তোমাকে স্বর্গের গেট স্বচ্ছন্দে পার হতে দিবে। আবার যদি তোমার কাছে টিকিট থাকে এবং সঙ্গে অতিরিক্ত মালপত্র থাকে, তবে শিয়ালদহে চেকার দস্তুরমত পরীক্ষা করে তবে তোমাকে ছেড়ে দিবে ; জরিমানা (বা অতিরিক্ত মাশুল আদায়) করতে এবং কাজ বিশেষে তোমাকে বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত হাজতে রাখতেও পারে। মোট কথা তোমার ন্যায় কাজের সঙ্গে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকলে যেমন শিয়ালদহে তোমাকে নিয়ে টানাটানি করবে, তেমনি তোমার সৎকাজের বা ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের সঙ্গে পাপের বা অন্যায়ের লেশ মাত্র থাকলে পরকালে তোমাকে নিয়ে টানাটানি করবে। কিন্তু যদি তোমার কাছে টিকিটও না থাকে এবং সঙ্গে অনেক মালপত্র থাকে তাহলে যেমন নিঃসন্দেহে শাস্তি ভোগ করবে, পরকালেও ঠিক তেমনি।

আমি—দেখুন, আমাদের ধৰ্ম্ম মতে আমরা একথা বিশ্বাস করি যে শেষ বিচারের দিন (হাশরের দিন) প্রত্যেক আত্মার পাপ পূণ্যের বিচার করা হবে ; তারপর একেবারে যারা নিষ্পাপ তাদের সোজাসুজি বেহেশ্‌তে (স্বর্গে) পাঠান হবে, যারা পাপও করেছে এবং পূণ্যও করেছে তাদের প্রথমে হিসাব মত কিছুদিন দোজখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে তার পর বেহেশ্‌তে

পাঠান হবে, এবং যাদের কোনই পুণ্য নাই তাদের অনন্ত কালের জন্য নরকে পাঠান হবে। (আমার মনে হয় একেবারেই কোন পুণ্য বা সৎকাজ করে না এমন লোক দুনিয়াতে নাই।). এবং সেই বিচারের দিনের পূর্ব্বে পবিত্রাত্মাগণকে কবরে শান্তিতে ও পাপীগণকে গোর আজাব (কবরের শাস্তি) এর মধ্যে দিয়ে কাটাতে হবে।—এই সমস্ত ব্যাপারের কোন সাদৃশ্য ট্রেণের সঙ্গে আছে কি ?

তিনি—ঠিক তেমনটী না হলেও কিছু সাদৃশ্য আছে বৈকি ? মনে কর রানাঘাট জংসনে একজন 'চেকার' একটা গাড়ীতে উঠে ঠিক তিন রকমের তিনজন যাত্রী দেখতে পেল, এবং তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য শিয়ালদহে নামা। প্রথম জনের টিকিট আছে এবং সঙ্গে তেমন জিনিষ পত্রও নাই। তাঁকে চেকারের বলার কিছুই নাই। অতএব তিনি নিশ্চিন্ত মনে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত গেলেন। দ্বিতীয় জন টিকিট দেখালেন বটে, কিন্তু সঙ্গে প্রায় দেড়মণ ওজনের একটা বাক্স এবং পয়সার অভাবে সেটা 'বুক' করিতে পারেন নাই। তাঁকে চেকার একটু কড়া কড়া কথাই শুনালো। তৃতীয় জন একটা ধড়িবাজ। সে টিকিট তো কিনেই নি তার উপর প্রায় একমণ ওজনের পাঁচ ঝুড়ি আম নিয়ে যাচ্ছে। 'চেকার' তাকে খুব ধমকে দেওয়ায় সে বললো যে, কলিকাতার কোন এক সাহেবকে নাকি সে আম দিতে যাচ্ছে, এবং সাহেবের কাছে কোন

কিছু নিয়ে যেতে হলে যে টিকিট কিনতে হয় এবং মালগুলি 'বুক' করতে হয় সে কথা তার জানা নাই। 'চেকার' তো এ দুটো শিকারকে পাহারা দিবার জন্য আর কোন গাড়ীতে না গিয়ে সেখানেই বসে পড়লো (এবং মাঝে মাঝে তাদের বেশ ধমকাতে লাগলো) কারণ এতে তার চাকুরীর উন্নতি হতে পারে।—এখন এই দুটা যাত্রী শিয়ালদহে পৌঁছার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে অশান্তি, ভয় ও দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে সময় কাটাল, তাকে তোমার গোর আজাবের মত বলা যেতে পারে। তারপর শিয়ালদহে পৌঁছে প্রথম লোকটী সচ্ছন্দে টিকিট দিয়ে 'গেট' পার হয়ে গেলেন, কিন্তু পরের দুইটা বন্দী হলো। হয়তো দ্বিতীয়টা অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করার পর নিষ্কৃতি পেল, আর তৃতীয় জন লাঞ্ছনা ভোগ তো করলই তার উপর তার জুয়াচুরির জন্য সে জেলে গেল।—তোমার পাপ পুণ্য মিশান (হাশরের দিনের) লোকের সঙ্গে দ্বিতীয় লোকটার এবং একেবারেই পুণ্যহীন লোকের সঙ্গে তৃতীয় লোকটার তুলনা করা যায়, কি বল?

আমি—আচ্ছা, এ ব্যাপারটার কিরকম অর্থ হয় বলতে পারেন? এই যে আমাদের শাস্ত্রে বলে (এবং বোধ হয় সকল ধর্ম্মেরই এই মত) যে, যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না বা মানে না, তারা জগতে যতই সৎ কাজ করুক না কেন, তাদের দোজখে পুড়তেই হবে।

"দেখ, এখন আমার পায়খানা করার সময় হয়েছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ফিরে এসে তোমার কথার উত্তর দিচ্ছি।" ইহা বলিয়া তিনি ঘরের মাঝখানে যে আগুনের স্তূপ ছিল তাহার উপরে যাইয়া উপুড় হইলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার বেল্টে (কমর বন্ধে) ছিদ্রযুক্ত উজ্জ্বল পিতলের চাপড়াশ ছিল, এবং তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার পেটের মধ্যে আগুনের মত কি যেন দেখা যাইতেছিল। এখন তিনি সেই চাপড়াশ রূপ কপাট খুলিয়া একটা প্রায় চল্লিশ হাত লম্বা লৌহ দণ্ড দিয়া পেটের মধ্যে হুড়াইতে লাগিলেন; শব্দ হইল—ঘটাং ঘটাং ঘট্ ঘট্ ঘটর্ ঘট্, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে হড়্ হড়্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া প্রায় ত্রিশ মণ ছাই মিশান জ্বলন্ত আগুন সেই অগ্নিস্তূপে পড়িল। অমনি ঘরটা আরও একটু গরম বোধ হইল। এমন ব্যাপার জন্মে দেখি নাই বা কেহ দেখিয়াছে বলিয়াও শুনি নাই। হাঁ, এঞ্জিন না হইলে এমন খাওয়া আর এমন পায়খানা কাহার হইবে যাহা হউক জ্বরের দৌলতে যে আজ বহুমূল্য জ্ঞান ও আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ হইল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ("খোদা যা করেন সমস্তই মঙ্গলের জন্য, একথা যে সত্য তাহা এতদিনে বেশ অনুভব করিলাম)।—

তাহার পর তিনি পেটের কপাট-টা ভালরূপে বন্ধ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হাসিয়া

বলিলেন—"আমার কাণ্ডগুলো দেখে আশ্চর্য্য বোধ করছো না ? কিন্তু এখন তোমার ভয় দূর হয়েছে কি বল ? (বাবা, সে কি হাসির রূপ ! দেখিলেই প্রাণ কাঁপে !!)

আমি—জী না, ভয় এখনও যথেষ্টই আছে, কারণ আপনার দিকে দেখলে আজরাইলের (যমরাজের) কথাই মনে পড়ে। তবে আপনি যে আমার কোন ক্ষতি কোরবেন না এই বিশ্বাস এবং আপনার প্রতি আমার ভক্তি এই দুইটা মিলে ভয়টাকে কাবু করে ফেলেছে।

তিনি—সে কথা যাক, কারণ সময় অল্প। তাড়াতাড়ি না করলে সমস্ত বিষয় বলার সময় পাব না।—দেখ, কোন ট্রেনে চড়ে কোথাও তুমি যাচ্ছ। তোমার সঙ্গে টিকিট আছে এবং বাক্সে অন্য কোন জিনিষই নাই। কেবল তোমার পকেটে তোমাদের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কতকগুলি গোপনীয় চিঠি পত্র আছে। তারপর মনে কর একজন গোয়েন্দা পুলিশ তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে লক্ষ্য করে সেই গাড়ীতে চড়েই চলেছে, এবং তোমার কথাবার্ত্তায় ও হাব ভাবে তার মনে সন্দেহ জন্মেছে। এ অবস্থায় তুমি যে ষ্টেশনে নামলে সেখানে সে নেমেই চট্ করে তোমাকে পরওয়ানা দেখিয়ে গ্রেপ্তার করলো এবং খোঁজ করে তোমার গোপনীয় কাগজপত্রগুলি বের করে নিল। তারপর তোমাকে ষ্টেশন মাষ্টারের হেফাজতে রেখে দিয়ে পুলিশ কনেষ্টবল ডাকতে

গেল।—এখন কি তুমি টিকিট দেখিয়েই নিষ্কৃতি পাবে, না রেল বিভাগের কোন আইনই অমান্য করনি বলে রক্ষা পাবে? তোমার এই অপরাধের জন্য অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে না কি? অবিশ্বাসী বা আল্লাহকে অমান্যকারী লোকদের অবস্থাও ঠিক সেই রকম।.......

(তারপর আর একটা ব্যাপার দেখ—তুমি হয়তো টিকিট নিয়ে ট্রেণে উঠেছ, বেশী মাল পত্রও নাই এবং তুমি রাজদ্রোহীও নও। কিন্তু তুমি ট্রেনে চলার সময় একজনের উপর অত্যাচার করলে বা কাহাকেও প্রহার করলে, এ অবস্থায় যেমন ষ্টেশনে নেমেই বিচারের জন্য বন্দী হতে হবে, সেইরূপ তুমি ধর্ম্মের সমস্ত কাজ করেও যদি কাহারও প্রতি কোন অন্যায় কর তবে পরকালে তার জন্য শাস্তি পেতে হবে, এবং যাহাকে কষ্ট-দিয়েছ সে তোমাকে ক্ষমা না করলে তোমার রক্ষা নাই। অথচ এই সত্যটা তোমরা তুচ্ছ বলে মনে কর।)

আমি—আচ্ছা, সকলে যদি নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করবে, তবে সাধারণ লোকে সাধু দরবেশ প্রভৃতির নিকট দোয়া নিতে যায় কেন?

তিনি—এটা একটা সোজা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি জান, যে ট্রেনে চড়ে তুমি যে ষ্টেশনে নামলে সেখানে যদি টিকিট দেখাতে না পার তবে তোমার শাস্তি হতে পারে।

কিন্তু সে সময় যদি তোমার পরিচিত কোন 'চেকার' বা রেলকর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত হয়ে তোমার জন্য সুপারিশ করেন, তবে তুমি রক্ষা পেতেও পার। এই সুবিধার জন্যই দেখবে অনেকে রেল কর্ম্মচারীদের সঙ্গে খাতির জমাতে চায়।— তেমনি সাধু, দরবেশ, এঁরা বিশ্বপ্রভুর প্রিয় পাত্র। কাজেই তাদের প্রার্থনায় ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হতেও পারে, এই আশায় সাধারণ লোকে তাঁদের দোয়া নিতে চায়।

আমি—ট্রেনের কাছে এসব ছাড়া আর কিছু শিখবার আছে কি?

তিনি—নিশ্চয় আছে। ট্রেনের সম্বন্ধে তুমি যত বেশী চিন্তা করবে ততই তোমার শিক্ষার বিষয় বেড়ে যাবে। সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করার মত সময় না থাকলেও আমি সংক্ষেপে দুটি বিষয়ের দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তার মধ্যে একটী হচ্ছে সময়ের সদ্ব্যবহার, আর একটী হচ্ছে অজ্ঞ থাকার বিপদ এবং এ দুটীর সঙ্গে তোমার সাংসারিক ও পার-লৌকিক জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

আমি—সেটা কি রকম আর একটু পরিষ্কার করে বলুন।

তিনি—প্রথমতঃ যথা সময়ে সকল কাজ না করলে পরে অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হতে পারে। যেমন প্রত্যেক ষ্টেশনেই কোন একটা ট্রেণ পৌছার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, এবং সেই সময় তার রাস্তাটা অতি অবশ্য সতর্কতার

সহিত পরিষ্কার করে রাখা হয়। কিন্তু সে যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে নিজের খেয়াল মত এসে পড়ে, তবে রাস্তা ঠিক না থাকার কারণে হয় সে 'লাইন' থেকে পড়ে যাবে, অথবা সে অন্য গাড়ীর সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে চুরমার হয়ে যাবে। (অবশ্য অদৃষ্টগুণে বেঁচে যাওয়াটাও অসম্ভব নয়।) আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আসলে ও তার অনেক বিপদ ঘটতে পারে। তোমার সাংসারিক জীবনের কাজগুলিও সেই রকম। প্রত্যেকটা কাজ যথাসময়ে না করার ফলেই মানুষ অনেক সময় বিপদাপন্ন হয় কিন্তু সেটা তারা বুঝতে পারে না।—দ্বিতীয়তঃ মনে কর ট্রেণে বিপদের সময় যে শিকলে টান দিতে হয়, কেহ অজ্ঞতা বশতঃ সেটায় বেশ করে এক টান দিল এবং যথা নিয়ম ট্রেণ থেমে গেল; অথবা সে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠে গদীর উপর শুয়ে যখন আরামের একটা আন্দাজ বুঝতে চেষ্টা করছে সে সময় একজন চেকার উঠে তাকে ধরে ফেললো। এ অবস্থায় যেমন সে তার অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে শাস্তি বা জরিমানার হাত এড়াতে পারবে না, তেমনি তুমি যদি প্রকৃতি বিরুদ্ধ বা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন কাজ কর, তবে নিশ্চয় তুমি তার ফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। —একটা ছোট ছেলে কিছু জানে না বলে কি তার হাত আগুনে পুড়বে না? তুমি অজানাতে বিষ খেলে কি মরবে না? তেমনি

তুমি জগতে প্রতিদিন ছোট খাট এমন অনেক পাপ কাজে লিপ্ত থাক যেটাকে তুমি পাপ কার্য্য বলে জান না, কিন্তু তার জন্য তোমাকে পরকালে পূর্ণ মাত্রায় শাস্তি পেতে হবে। তখন কিন্তু 'জানি না' বলে রেহাই পাবার উপায় থাকবে না। এইজন্য তোমাদের বহুদর্শী ধর্ম্ম গুরু জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব বলেছেন— জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং সেজন্য যদি আরব থেকে (সুদূর) চীন দেশে যেতে হয় সেও স্বীকার, (তবু তোমরা জ্ঞান লাভে ক্ষান্ত হবে না।)— কিন্তু তোমরা এখন তাঁহার সেই বহুমূল্য উপদেশের মর্য্যাদা রেখেছ কি ?

আমি জী—না, অনেক মুসলমান একথা জানেই না। শুধু তাই নয়, আমরা আজ এতদূর অধঃপাতে গিয়েছি যে শত করা নিরানব্বই জন মুসলমান তাঁর অমূল্য জীবনীর কোন সংবাদই রাখেন না।

তিনি—সেকথা যাক। তোমাকে আমি ট্রেন সম্বন্ধে মোটা-মুটিভাবে অনেক কথাই বলেছি। এখন আমি দ্বিতীয় বিষয়টীর একটু আভাস দিব। আমার মনে হয় তোমার মন এখন এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে, আমি দ্বিতীয় বিষয়টী সম্বন্ধে সামান্য একটু উল্লেখ করলেই নিজে নিজে চিন্তা করে সে সম্বন্ধে অনেক সত্য আবিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। ঘন ঘন খাওয়া আমার অভ্যাস। কথায় কথায়

অনেকক্ষণ ধরে কিছু খাইনি তাই পেটটা এমন চন্ চন্ করছে যে আর স্থির থাকতে পারছি না।—এই কথা বলিয়া তিনি পূর্ব্ববর্ণিত নিয়মে প্রায় একশত মণ কয়লা আর সাতশত মণ পানি উদরস্থ করিয়া দুই তিন মিনিট ধরিয়া ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি ও তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহার সহিত তাঁহার নাসিকা দিয়া গাঢ় মেঘের মত কাল রংএর ধূম বাহির হইতে লাগিল, এবং তাহা দেখিয়া আমার মনে পুনরায় ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁহার পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিলেন।

আমি—আপনি প্রত্যেক বার কিছু খাওয়ার পর এমন ছুটাছুটি করেন কেন ? সত্যি—ওতে আমার খুব ভয় হয়।

তিনি –কিছু খেলে আমার পেটের মধ্যে বাষ্প আর ধোঁয়ার চাপ খুব বেড়ে যায়। সে সময়ে লাফালাফি করলে তার কতকটা তাড়াতাড়ি নাক দিয়ে বেরিয়ে যায়, এবং আমি তাতে অনেকটা হালকা বোধ করি। যদি এই উপায়ে ওগুলিকে বের করে না দেই তবে পেটের মধ্যে বাষ্পের চাপ খুব বেড়ে গিয়ে হঠাৎ আমার মাথা গরম হয়ে আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে নিজের ও অন্যের ক্ষতিকর অনেক কাজ করতে পারি। কিন্তু দেখ, অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগার জন্য আমি এবার খুব বেশী পরিমাণে খেয়েছি ; এমত অবস্থায় পেট ফেটে অনেক এঞ্জিন মারা পড়ে। তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি এরকম

অপঘাত মৃত্যুর লক্ষণগুলো পূর্ব্বেই টের পাব এবং সে সময় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না, বসে পড়তে বাধ্য হব। আমি বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রাণপণে ছুটে এই ঘরের শেষ প্রান্তে চলে যাবে। তুমি তো জানো আমার শরীর লোহা দিয়ে তৈরী। কাজেই এর একটা টুকরা তোমার দিকে ছুটে গেলে আর রক্ষা নাই।

ইহা শুনিয়া আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম, এবং যাহাতে এই অপ্রিয় ঘটনাটা না ঘটে সেই জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, ভয়টা যে শুধু নিজের জন্যই হইয়াছিল এমন নহে, তাঁহার কথা ভাবিয়াও দুঃখ হইতেছিল। কারণ এইরূপ একজন জ্ঞানী সজ্জনের আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক।

"হাঁ, তোমাকে যে দ্বিতীয় বিষয়টার কথা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা আর কিছুই নয়, এই এঞ্জিন জীবনের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করা।

আমি—ও বুঝেছি, আপনি বলতে চান যে, প্রত্যেক প্রাণীই এক একটা এঞ্জিন বিশেষ, কি বলেন ?

তিনি—হাঁ, ঠিক তাই। শুধু তাই নয়, এই দুনিয়ার সব কিছুই এক একটা এঞ্জিন বিশেষ। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা গুপ্ত অদৃশ্য শক্তি আছে, যার সাহায্যে সে তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে।

আমি—কিন্তু এর মধ্যে একটা জিনিষের সাদৃশ্য নাই বলে মনে হয়: সেটা হচ্ছে এই যে, আপনি আগুন ও জলের সাহায্যে চালিত হচ্ছেন কিন্তু আমরা এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছি।

তিনি—এই দেখ, তুমি একটা বড় রকমের ভুল করে বসেছ। আমি তো বাষ্পদ্বারা চালিত হচ্ছি, আগুন ও জল তার উপলক্ষ মাত্র। তুমি যেমন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আহার করে থাক, এও ঠিক তেমনি।

আমি—তা হলেও আপনার বাষ্প তো বের হলে দেখা যায় কিন্তু আমাদের শক্তি তো দেখা যায় না!

তিনি—না, বাষ্প তুমি দেখতে পার না। তোমার শক্তিকে যেমন কোন কাজে নিযুক্ত করলে সেটা বুঝতে পার, তেমনি বাষ্প যখন আমার ভিতর থেকে বের হয়ে এসে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মিশে ছোট ছোট অসংখ্য জলবিন্দুর সৃষ্টি করে তখনই তুমি দেখতে পাও। তুমি বাষ্প দেখ না, বাষ্প হইতে সৃষ্ট জলকণাগুলিই দেখে থাক।

আমি—সেটা সত্য বটে। কিন্তু আপনি একটা বিষয়ের উল্লেখ করেননি। আমরা যে আত্মার দ্বারা চালিত হচ্ছি, তার সঙ্গে তো আপনার ভিতরের কোন জিনিষের সাদৃশ্য নাই। যেমন মনে করুন, আপানার বাষ্প অদৃশ্য জিনিষ হলেও সেটা আপনার মধ্যে কম বা বেশী হতে পারে এবং আমার শরীরের

শক্তিও অসুখের সময় কম আর সুস্থ সময়ে বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু আত্মার তো তেমন বেশী কমি হয় না। আমি দুর্ব্বল হলে আমার আত্মা অর্দ্ধেক আর খুব সবল হলেই আমার পাঁচটা আত্মা এরূপ তো কখনও হতে পারে না!

তিনি—দেখ, এ সমস্ত অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের আলোচনা করলে তোমার মত ছেলে মানুষের পক্ষে বুঝতে খুবই কষ্ট হবে। তার ওপর এ সমস্ত বিষয় বোঝার জন্য পূর্ব্বে তৈরী হওয়া উচিত। তা না হলে তোমার মাথা বিগড়ে গিয়ে তুমি পাগল হয়ে যেতে পার।

আমি—সে কি রকম? আমি এ বৎসর বি, এ. পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি; দুদিন পরে গ্র্যাজুয়েট হতে পারলে সবাই মানুষ বলে স্বীকার করবে; কত নাম করা লেখকের বই পড়েছি। আর আপনি আমাকে এখনও ছেলে বলে মনে করছেন?

তিনি—হাঁ, আমি কোনই ভুল করিনি। তুমি যে সমস্ত শিক্ষা পেয়েছ সেটা তোমার সাংসারিক উন্নতির পক্ষে (?) এবং তোমার আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধেই কাজ করবে। তুমি যদি দুনিয়াদারীর বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে, তা হলে আমি তোমাকে খুব সেয়ানা বলেই মনে করতাম এবং তোমাকে ওস্তাদ বলে মেনে নিতাম। কিন্তু তুমি যে বিষয়ের কথা উঠিয়েছ, সে সম্বন্ধে তুমি একেবারেই অজ্ঞ এবং নেহায়েৎ নাবালক। তুমি হয়তো কলেজে দর্শন শাস্ত্র পড়।

কিন্তু প্রায়ই সেগুলি যুক্তি, কুটতর্ক ও চিন্তার দ্বারা লেখা হয়েছে, আবার কোনটা বা খুব নাম করা শয়তানের পাণ্ডাদের লেখা। ঐ সমস্ত পুস্তকে কোন সাধকের তপস্যালব্ধ অভিজ্ঞতার উল্লেখ পাবে না। এমন অবস্থায় তুমি বি. এ, পাস করে আত্মা ও পরমাত্মা সমন্ধে কী বা এমন জ্ঞান লাভ করবে? তোমার বর্ত্তমান শিক্ষার উপকারিতা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু এর মধ্যে মারাত্মক দোষের সংখ্যাই বেশী? যাক, এসমস্ত কথা এখন বলে লাভ নাই। এ বিষয়ে তুমি নিজে নিজে চিন্তা করলেই অনেক কিছু জানতে পারবে।

আমি - তাহলে বলুন আপনার মধ্যে আত্মার মত কিছু নাই!

তিনি—দেখ, সৃষ্টিকর্ত্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের আত্মাটী। এ অতি সূক্ষ্ম, অতি সুন্দর, চিন্তার অতীত, অক্ষয়, অমর কিছু। এর সঙ্গে পার্থিব কোন জিনিষের তুলনা করতে যাওয়াই বোকামি। এটা সমস্ত যুক্তি তর্ক ও চিন্তার বাহিরে। কেবল দৃঢ় বিশ্বাস ও পবিত্র অন্তরের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী একাগ্রচিত্তে কঠোর সাধনার দ্বারাই ইহার পরিচয় রূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে!—তবু তোমাকে একটা বিষয়ের কথা বলছি আত্মার (রূহের) সঙ্গে যার সাদৃশ্য আছে বলা যেতে পারে।—

একথা নিশ্চয় জেনো যে, শুধু বাষ্প কোনদিন কোন কাজ করতে পারে না। তুমি একটা পাত্রে করে জল ফুটাও, দেখবে

অনেক বাষ্পতৈরী হয়ে বাতাসে মিলে যাচ্ছে ; তাদের কোনই কাজ করবার শক্তি নাই। কিন্তু যদি সেই পাত্রটার মুখ একেবারে বন্ধ করে আগুনের উপরে বসিয়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়, তাহলে দেখবে পাত্রটা লাফাতে সুরু করেছে ; এবং ফেটে যাওয়াও আশ্চর্য্য নয়।—কিজন্য এমন হয়? —না, বাষ্প বের হতে না পারায় পাত্রের ভিতরে একটা শক্তির (চাপের) সৃষ্টি হয়। আমার মধ্যেও ঠিক সেই রকম হয়। এই শক্তিই কতকগুলো বাষ্পকে জোর করে বের করে দিতে চায়। তার ফলে সেই পাত্রটা লাফায় বা ফেটে যায় ; এবং সেই জন্যই এঞ্জিনের ভিতর থেকে তার চাকাকে ঠেলা দিয়ে কিছুটা বাষ্প বেরিয়ে যায়। তোমার আত্মার আদেশে যেমন একটা শক্তি তোমাকে চালায়, তেমনি আমার ভিতরের এই শক্তি বা 'চাপের' আদেশে বাষ্প আমাকে চালায়। এই শক্তিকে তুমি দেখতে শুনতে বা অনুমান করতেও পার না। শুধু এটুকু বুঝতে পার যে, এটা একটা শক্তি।— আবার দেখ তোমার দেহ নষ্ট হলে, অর্থাৎ দেহের যে গুণটা আত্মাকে ধরে রেখেছে সেটা নষ্ট হলে যেমন তোমার আত্মা দেহত্যাগ করে চলে যায়, তেমনি আমার মধ্যে কোথায়ও মরিচা ধরে, ক্ষয় হয়ে বা ভেঙ্গে গিয়ে আমি শক্তি ধারণের অযোগ্য হলে সেই শক্তি আমার বাহিরে চলে যায় ; এবং তোমার আত্মার যেমন ধ্বংশ নাই, তেমনি এই শক্তি বা প্রাকৃতিক নিয়মেরও ধ্বংশ নাই। তবে এই পৃথিবী

ধ্বংশের পর এ নিয়মটী থাকিবে কিনা সেটা আমি বলতে পারি না।

আমি—আপনার সঙ্গে যে অনেকগুলো গাড়ী জুড়ে দেওয়া হয় তার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন ব্যাপারের সাদৃশ্য আছে কি ?

তিনি—নিশ্চয় আছে। এখানে কেবল নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য কোন জিনিষকে সৃষ্টি করা হয়নি। আমার চলার পথে যেমন কতকগুলি গাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়, তেমনি প্রত্যেকের সঙ্গে কতকগুলি কর্ত্তব্যের বোঝা বেঁধে দেওয়া হয়। সে গুলি না করলেই মুস্কিল। যেমন মনে কর, গাছ বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে, ফুল ফুটাবে, ফল দিবে, মানুষের বা জীবজন্তুর সেবায় লাগবে; মানুষ তার কর্ত্তব্য পালন করে উন্নত হতে চেষ্টা করবে: তুনিয়া তার নির্দ্দিষ্ট পথে যথানিয়ম সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরে সৃষ্টি রক্ষা করবে ইত্যাদি (সূর্য্য কার পানে ছুটেছে কে জানে) ?

আমি—আপনি একটা লোকের দ্বারা চালিত হন, আমরা তো তেমন কারও দ্বারা চালিত হই না !

তিনি কেন, তোমাদের মনটা কোথায় থাকে ? সেই মনটাই তোমাদের পথপ্রদর্শক। 'ড্রাইভার' বা চালক আমার কেউ না হলেও যেমন চলার পথে তার সাহায্য নিতে হয় বলে তার সঙ্গে আমার একটা অস্থায়ী সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়, এবং আমার

ড্রাইভার হুঁসিয়ার ও ভাল লোক হলে আমি নিরাপদে থাকি, কিন্তু আনাড়ী বা মাতাল হলে আমার সর্ব্বনাশ করতে পারে ; তেমনি তোমার মনটা যদি সুমতি বিশিষ্ট হয় তবেই তোমার মঙ্গল, আর তা না হলে অর্থাৎ সে শয়তান বা কুমতির দ্বারা চালিত হলে তোমার ধ্বংশ নিশ্চিত !

আমি—দেখুন, কোন এঞ্জিন ছোট, কোনটী খুবই বড়, কোনটী এক জায়গায় বসে কাজ করে কেহবা কেবল ছুটে বেড়ায়, কেহ লাইনের বাহিরে যেতে পারে না আবার কেহ সর্ব্বত্রই চলতে পারে, কেহ জলের মধ্যে ডুব দিয়ে যায় আবার কোনটী আকাশে উড়ে বেড়ায় ;—এসমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের জীবনের সাদৃশ্য আছে কি ?

তিনি—কিছুটা সাদৃশ্য আছে বই কি ? তবে তুমি একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করেছ যে এত অল্প সময়ে সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবু মোটামুটি ভাবে যতটুকু বলা সম্ভব তাই বলছি,—এই প্রশ্নগুলি প্রধাণতঃ দুই দিক দিয়ে বিচার করা যায়। প্রথমতঃ জড়গতের দিক দিয়ে। যেমন বড় ও ছোট এঞ্জিনের সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের তুলনা ; এক-জায়গায় কাজ করা এঞ্জিনের সঙ্গে দোকানদার, কেরাণী, গদীয়ান প্রভৃতি যারা একজায়গায় বসে জীবিকা উপার্জ্জন করে তাদের তুলনা ; যে সমস্ত এঞ্জিন সর্ব্বত্র ছুটে বেড়ায় তাদের সঙ্গে ব্যাপারী সদাগর, চিকিৎসক, গৃহস্থ প্রভৃতি লোকের তুলনা, জলের মধ্যে

ডুব দিয়ে যেগুলি চলে তাদের সঙ্গে অজ্ঞাত মূর্খ লোকের তুলনা; এবং যেগুলি আকাশে উড়ে বেড়ায় তাদের সঙ্গে খুব নাম করা শিক্ষিত লোকের তুলনা প্রভৃতি করা যেতে পারে।— দ্বিতীয়টা হচ্ছে আত্মোন্নতি ও ধর্ম্মের দিক দিয়ে তুলনা।—যেমন ছোট ও বড় এঞ্জিনের সঙ্গে মূর্খ ও জ্ঞানীর তুলনা; এক জায়গায় কাজ করা এঞ্জিনের সঙ্গে একস্থানে ধ্যান রত সাধকের; যারা সর্ব্বত্র ছুটাছুটি করে তাদের সঙ্গে ধর্ম্মে আস্থাহীন চঞ্চলমতি লক্ষ্যবিহীন লোকের: লাইন ছাড়া চলে না এমন এঞ্জিনের সঙ্গে ধর্ম্মে অচলমতি সচ্চরিত্র দুনিয়াদার লোকের; যেগুলি জলের মধ্যে ডুবিয়া চলে তাদের সঙ্গে অবিশ্বাসী, দুষ্ট, কুচরিত্র লোকের; এবং যেগুলি উড়িয়া চলে তাদের সঙ্গে পবিত্রাত্মা সিদ্ধপুরুষ দরবেশ, সন্ন্যাসী প্রভৃতির তুলনা করা যেতে পারে। এ সমস্ত বিষয় তুমি ধীরভাবে নির্জ্জনে চিন্তা করে দেখলে অনেক নূতন সত্যের সন্ধ্যান পাবে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলার আছে, কিন্তু তোমার আর সময় নাই এখনি যেতে হবে।

আমি—দেখুন আর দুই একটা প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারছি না। কারণ আপনার কাছে জীবনে যে দ্বিতীয় বার আসতে পারব তেমন ভরসা নাই,। আর এঞ্জিন সম্বন্ধে আমার এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করার উপযুক্ত লোকও আমি চিনি না। কাজেই দয়া করে আমার আর দু একটা প্রশ্নের উত্তর দেন। বাস্তবিকই আপনাকে যে আমি কি বলে ধন্যবাদ দিব তা ভেবে ঠিক করতে পারছি না।

তিনি—বেশ, তোমার আর কি বলার আছে তাড়াতাড়ি বলে শেষ কর।

আমি—একটি বিষয় আমি বুঝতে পারছি না। দরবেশ বা সিদ্ধ পুরুষগণ কি উড়ো জাহাজের মত উড়তে পারেন?

তিনি—ও, এই কথা? বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি, মন দিয়ে শোন। তুমি জান যে, মাটীর একটা আকর্ষণ শক্তি আছে, সেটা সবারই উপর কাজ করে। কিন্তু উড়ো জাহাজ এমন ভাবে নিজের শরীরটাকে তৈরী করেছে, এবং এমন শক্তি পেয়েছে যে সে ইচ্ছা করলে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন ধরে শূন্য পথে চলতে পারে। তার সে গতিকে মাটীর আকর্ষণ শক্তি বাধা দিতে পারে না। ঠিক সেই রকম সিদ্ধপুরুষগণ এমন ভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলেছেন এবং এমন শক্তির অধিকারী হয়েছেন যে, তাঁরা ইচ্ছা করলে জগতের সমস্ত বিষয় ভুলে গিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে বহুদূর অগ্রসর হতে পারেন। সে সময় তাঁদের দেহটী মৃত দেহের মত পড়ে থাকে। উড়ো জাহাজের মাটির আকর্ষণকে উপেক্ষা করার মতই তাঁরা দেহের বা জগতের আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারেন। তবে তাঁদের সে শক্তিরও একটা সীমা আছে। কাজেই কিছুক্ষণ পরে তাঁরা তাঁদের জড় দেহে পুনরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়; যেমন উড়ো জাহাজকেও মাটীতে নামতে হয়। যাক, এ সমস্ত কথা বাদ দাও; কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি যে এগুলি তুমি ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছ না।

আমি—আর দেখুন, অনেক রকমের এঞ্জিন আছে। কোনটা জলের দ্বারা চালিত (যেমন নায়াগ্রা জল প্রপাতের জলের ধাক্কায় চালিত এঞ্জিন।) কোনটা বাষ্পের দ্বারা, কোনটা কেরোসিন, কোনটা মোটা তেল (ক্রুড অয়েল,) কোনটা পেট্রোল, কোনটা গ্যাস, আবার কোনটা বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়। এ সকলের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন সাদৃশ্য আছে কি ?

তিনি—এইতো আবার তুমি বড় বড় কথা টেনে আনলে। এ বিষয়ে তোমাদের নিশ্চয় সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সে বিষয় বুঝিয়ে বলতে গেলে একটা প্রকাণ্ড বই হয়ে যাবে। অথচ এদিকে সময় খুব কম !—তবু সংক্ষেপে বলছি শোন।—নানারকমের এঞ্জিনের মত তোমাদের মধ্যেও নানারকম ধর্ম্ম আছে। তোমরা মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি এক একটা ধর্ম্ম নিয়ে আছ। আকাশে উড়িতে পারাই যেমন এঞ্জিন জীবনের চরম উন্নতি, তেমনি আত্মাকে উন্নত করা ও তাকে দিব্যচক্ষু দান করাই সকল ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন এই উড়বার জন্য যে জাতীয় এঞ্জিন সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে মনে হবে সেটাই উড়ো জাহাজে লাগান হবে; তাছাড়া অন্য জাতীয় এঞ্জিন লাগালে তোমার উড়ো জাহাজ উড়তে পারে কিন্তু তাতে যেমন অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হবে; তেমনি তোমার আত্মোন্নতি ও দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য তোমার যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপযুক্ত সেটা অনুসরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ, তা না হলে বেশী অসুবিধা ভোগ

করতে হয় এবং তোমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতেও পারে। যেমন ষ্টীম বয়লার' চালিত এঞ্জিন লইয়া উড়োজাহাজ উড়িতে অক্ষম, তেমনি কোন কোন ধর্ম্ম মানবাত্মাকে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে অক্ষম অতএব বর্জ্জনীয়।

আমি—আচ্ছা, নাস্তিকদের আপনি কোন্ দলে ফেলবেন ?

তিনি—যে এঞ্জিন কোনকালেই এবং কোন মতেই উড়ো জাহাজে লাগানর যোগ্য নয় নাস্তিকদের আমি সেই দলে ফেলব।

আমি—এমন এঞ্জিন জগতে আছে কি ?

তিনি—হাঁ, আছে বৈকি ? তুমি জলের ধাক্কায় চালিত যে এঞ্জিনের উল্লেখ করেছ, আমি তার কথাই বলছি। তুমি উড়ো জাহাজ যত বড়ই করনা কেন, সেখানে একটা জলপ্রপাত নিশ্চয় রাখতে পারবে না। আবার জলের ধাক্কা না পেলে তোমার এঞ্জিন চলবে না বা উড়ো জাহাজও নড়বে না, উড়া তো দূরের কথা।—দেখ, আত্মপরিচয় ও আত্মোন্নতির মূলে হচ্ছে ধর্ম্ম পথে থেকে কঠোর সাধনা করা ; আবার ধর্ম্মের মূলে হচ্ছে বিশ্বাস (বিশুদ্ধ বিশ্বাস)। নাস্তিকদের মন এমনই অদ্ভুত হয়ে পড়ে যে, সেখানে সেরূপ বিশুদ্ধ বিশ্বাসের কোনই স্থান নাই। যদি পৃথিবীর সকল লোকই আত্মা বিশ্বাস করে, তবু সে একাই আত্মাকে ও সৃষ্টিকর্ত্তাকে অস্বীকার করবে। এমনি তার মন্ ! !

আমি—আপনি যে কিছু আহার করার পরেই খুব ছুটাছুটি

করে কিছু শক্তিক্ষয় করেন এবং তা না করলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের ও অন্যের ক্ষতি করার আশঙ্কা করেন. মানুষের জন্যও কি সেই নিয়ম ?

তিনি—হাঁ, সেই রকমই বটে। প্রত্যেক মানুষই যেন শক্তিশালী হবার সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজে লিপ্ত থাকে। তা না হলে তার মাথা ঠিক না থাকতেও পারে এবং সে সংসারের অনেক ক্ষতি করতে পারে।

আমি—আর একটা মাত্র কথা বললেই আমি ক্ষান্ত হব, দয়া করে এর একটা ছোট্ট উত্তর দিলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

তিনি—কি কথা, চট করে বলে ফেল। এরপর কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে। এদিকে আবার আমার শরীরটাও হঠাৎ কেমন কেমন করতে লেগেছে। অদৃষ্টে কি যে আছে ঠিক বুঝতে পারছি না !

আমি—এই যে আপনার ভিতরে অনবরত দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, এর সঙ্গে আমাদের কোন জিনিষের সাদৃশ্য আছে কি ?

তিনি—উঃ, তুমি তো আচ্ছা ছেলে। মনের গোপন কথাটুকু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে কি থাকতে পারতে না ?

আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিলাম—"দেখুন, আমি অজ্ঞাতসারে আপনার কাছে কোন অপরাধ করে থাকলে

তার জন্য করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি। এমন কথা জিজ্ঞাসা করলে যে আপনার মনে কষ্ট হতে পারে সে বিষয় স্বপ্নেও ভাবিনি।"

তিনি—হাঁ, এ কথায় আমার একটু কষ্টই হয়, তবে তুমি যখন কথাটা তুললেই তখন এসম্বন্ধে দু এক কথা বলছি শোন। তবে আমি নিশ্চয় জানি তুমি এ বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না।—

"আমি প্রথমে ছিলাম চিরমহান, চিরপবিত্র, চিরসুন্দর, সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছার মধ্যে। তার পর তিনি আমার অন্তরের ভক্তি ও প্রেমকে পরীক্ষার জন্য আমাকে মানুষের মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেন। মানুষ আবার আমাকে এই লোহার খাঁচায় বন্ধ করে আমার দ্বারা অনেক কাজ করিয়ে নিচ্ছে। আমি কিন্তু পূর্ব্বের কথা মোটেই ভুলতে পারিনি। তাই যখন আমার পূর্ব্বের কথা স্মরণ হয়, তখন আমি বিরহের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ি। কিন্তু আমার আত্মহত্যা করারও আদেশ নাই। তাই সেই পূর্ব্বের কথা যেন ভুলে থাকতে পারি, এবং বিরহের জ্বালা কিছু কম হয় সেজন্য পেটের মধ্যে (না বুকের মধ্যে ?) সর্ব্বদা আগুন জেলে রাখি এবং ছুটাছুটি করে মনটাকে হালকা করতে চাই।—তোমাদের অবস্থাও তেমনি। যদি সংসারের শোক তাপে তোমাদের হৃদয় দগ্ধ না হত, তাহলে তোমরাও তাঁর বিরহ জ্বালা সহ্য করতে পারতে না। উপরন্তু সংসারের আসক্তিরূপ আগুন মানুষের হৃদয়ে দিনরাত এমনি প্রবল ভাবে

জ্বলছে যে তারা সেই প্রিয়তম চিরসুন্দরের কথা একদম ভুলে গিয়েছে।—হায়রে মায়াময়ী সংসার! আর হায়রে মোহান্ধ মানব!! বাস্তবিকই তোমাদের জন্য শোক প্রকাশ করা উচিৎ।—দেখ এই বিরহের আগুনেই মানুষ ছাড়া আর সকলেই দিনরাত জ্বলে পুড়ে সারা হচ্ছে। এই সৃষ্টির প্রত্যেকটী জিনিষই প্রথমে সেই প্রিয়তমের অন্তরের মধ্যে ছিল। তার পর তিনি প্রত্যেকের প্রেম পরীক্ষা করার জন্য এই বিচিত্র বিশ্বজগতের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তোমরা সে কথা আজ ভুলে গিয়েছ। আহা, তাঁর কত দয়া! তিনি মানব জাতির এই ভ্রান্তি ও সংসারাসক্তি দূর করার জন্য যুগে যুগে কতই না ধর্ম্মগুরু বা পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন. কতভাবে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন, সে সব বিষয় কখনও চিন্তা করেছ কি? তুমি কি জান—নিরীহ বাতাস কোন দুখে সময় সময় পাগল হয়ে প্রলয় কাণ্ডের সৃষ্টি করে, কার জন্য চলন্ত মেঘ কোন কোন সময়ে অশ্রু সম্বরণ করতে না পেরে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে? কোন্ আক্ষেপে সে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করে উঠে? তার অন্তর থেকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎরূপে কিসের আগুন বের হয়? ঐ নীল আকাশের অযুত নক্ষত্র কোন দারুণ বিচ্ছেদ বেদনায়, কোন প্রিয় বিরহের শোকে সকল সময় নীরব হয়ে রয়েছে?—তুমি কি জান—পৃথিবীর অন্তরের তাপ কত?—সূর্য্য কোন বিরহ জ্বালায় দিনরাত ভীষণ ভাবে জ্বলে পুড়ে ছাই হচ্ছে...।”

হঠাৎ এক বিকট চীৎকার করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন! আমি প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া পরক্ষণেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গৃহের শেষ প্রান্তে গিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। অমনি বজ্রপাতের ন্যায় ভীষণ শব্দ হইল, আর সেই সঙ্গে তিনি ফাটিয়া চৌচীর হইলেন; সমস্ত ঘরখানি দেখিতে দেখিতে অগ্নিময় হইয়া গেল, এবং আমাকে বাষ্প ও ধূমে অস্থির করিয়া তুলিল! এদিকে কোথা হইতে একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ পাথুরে কয়লা ছুটিয়া আসিয়া আমার মস্তকে লাগায় আমি যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিলাম!!—

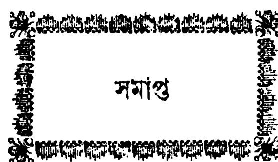
***চাহিয়া দেখি, আমি কোথায়? এ যে রাজসাহী ষ্টেশন! তবে কি ঘুমের ঘোরেই এত কাণ্ড হইয়া গেল? একজন যাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মশায় চোট পেয়েছেন নাকি?" আমি কিসের চোট জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া একজনের হাত হইতে একটা ছোট ষ্টীলের স্যুটকেস সশব্দে আমার মাথার কাছেই বেঞ্চের উপর পড়িয়া যায়. (সম্ভবতঃ তাহার একটা কোনার আঘাত আমার মাথায় লাগিয়া থাকিবে।) এবং সেই শব্দ শুনিয়াই আমি চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসি।

যাহা হউক আমি আর কিছু বলিলাম না। স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া দয়াময়ের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া বলিলাম— প্রভু, এই অধমের প্রতি যখন তোমার এতই অনুগ্রহ, তখন এই

দয়া কর যেন মাঝে মাঝে এই রকম স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত না হই !

রাজসাহী নিউ মোস্লেম হোষ্টেল । }
ইং ২৯।৯।৩৫ }

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আমার সমস্ত ভ্রাতা ভগ্নি স্বপ্নসুধা পাঠ করিয়া উপকৃত হন করুণানিধান বিশ্বপালকের নিকট অধমের ইহাই প্রার্থনা। (আমিন।)



১। এই তরুণ কবি ও তাপসের বিশ্বপ্রভুর প্রতি প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ কবিতার বই 'কুসুম' পাঠ করিলে প্রাণে নিশ্চয় শান্তি পাইবেন। ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই বইখানি পাঠ করা উচিত। মূল্য মাত্র ।৶০ ছয় আনা।

২। মানুষ আজ মাটী খুড়িয়া পুরাতন কীর্ত্তি উদ্ধার করিতে যত্নবান হইয়াছে, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সে তাহার হৃদয় খুজিয়া আপন পরিচয় জ্ঞান লাভ করিতে একেবারে উদাসীন। এই ভ্রান্তি ও তাহার ধ্বংসকর পরিণতি হইতে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল ভ্রাতা ভগ্নিকে ফিরাইয়া আনিতে কবির 'স্তূপ' (যন্ত্রস্থ) নিশ্চয় কাব্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। মূল্য ১।০ মাত্র।